25
1718
Bengali

25

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI.

Call No. __________

Accession No. 1718

GIPNLK—7/DAND—5-9-60—15,000

1A

যুগ-বাণী

Jug - Bani in Bengali

Lib 1161/76 P-3

প্রাপ্তিস্থান—

Arya Publishing House

আর্য্যপাবলিশিং হাউস্

College Street Market (1st floor)

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্—(দোতালায়)

Calcutta

কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩২৯। Kartik 1329 (B.S

by Qazi Nazrul Islam

কাজী নজরুল ইসলাম

Re 1/- only

মূল্য ১৲ এক টাকা।

৭নং প্রতাপ চাটুর্য্যের লেন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

NATIONAL ARCHIVES LIBRARY
No. 1718
D. 22172
GOVT. OF INDIA

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের অপর কয়েকখানা বই

১। অগ্নিবীণা প্রকাশিত হইল, সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১৲

২। ব্যথার দান, সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১॥০ টাকা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—

৩। অগ্নি-বীণা ২য় খণ্ড (কবির অপরাপর বিখ্যাত কবিতা ইহাতে থাকিবে।)

৪। রবার্ট এমেটের জীবনী—

৫। বাঁধন হারা—

৬। ধূমকেতু—

প্রাপ্তিস্থান—আর্য্য পাবলিশিং হাউস্
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দোতালায়)—কলিকাতা।

মেট্‌কাফ্ প্রেস্,
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্—কলিকাতা

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেন-গুপ্ত

শ্রীচরণেষু

রাঙা দা'!

তোমার চোখা লেখার জন্য নয়, তোমার মোহন রূপের জন্য নয়, তোমার বুক-ভরা স্নেহের জন্য নয়, তোমার উদার উন্মুক্ত বিরাট প্রাণ-শক্তির জন্য নয়, তোমার বেদনা-রক্ত ব্যর্থতার জন্যও নয়,—তোমার ভালোবাসার বিপুল সাহসিকা শক্তির জন্য, কোনো-কিছুকে না-মানার জন্য, বিদ্রোহের জন্য, তোমায় আমি আমার রক্ত-প্রণাম জানাচ্ছি।

তোমার আদর-সিক্ত
ছোটভাই
নুরু

4A

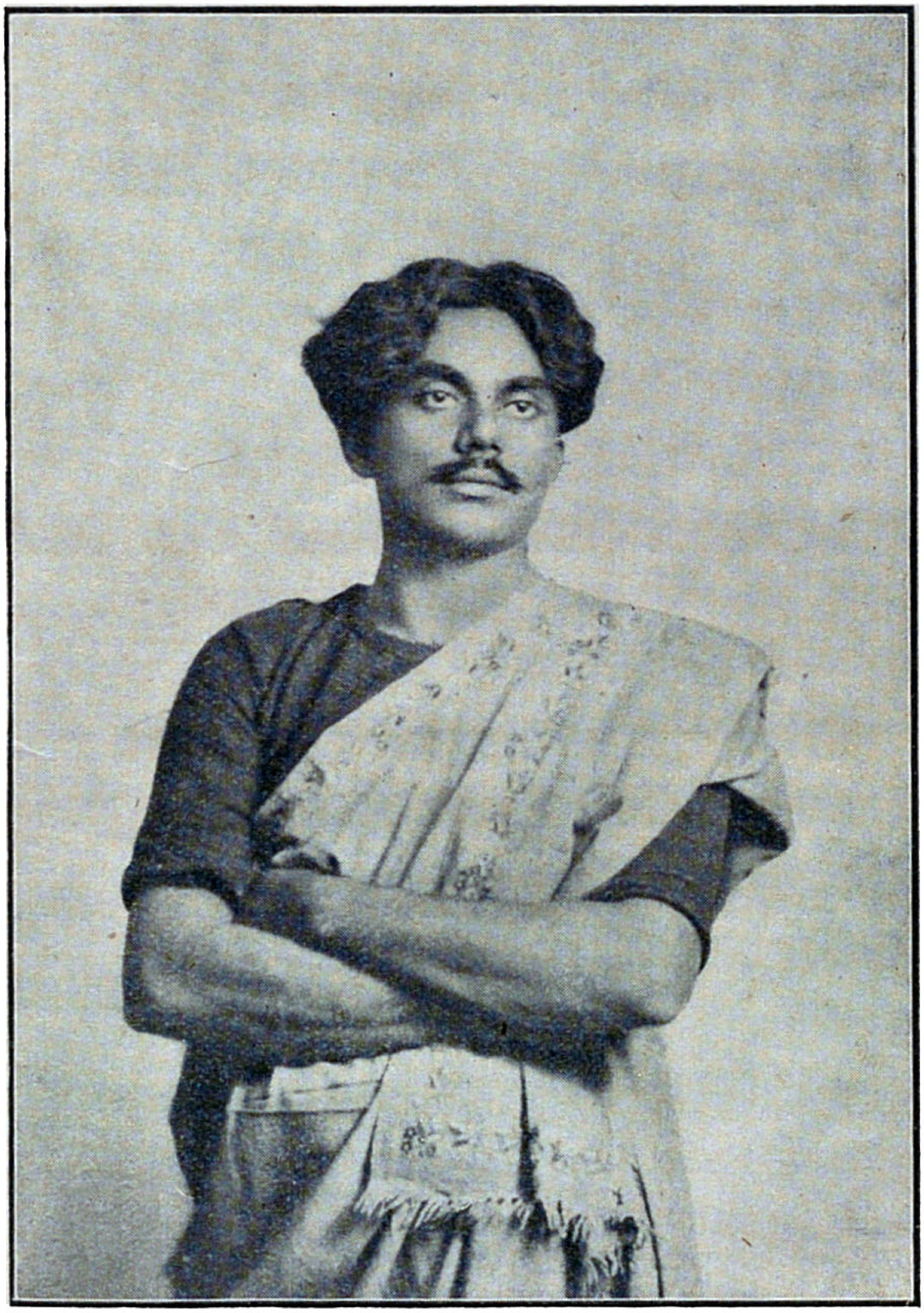

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা। ১৪৫৪।২২

যুগবাণী

নবযুগ

আজ মহাবিশ্বে মহাজাগরণ, আজ মহামাতার মহা আনন্দের দিন, আজ মহামানবতার মহা যুগের মহাউদ্বোধন! আজ নারায়ণ আর ক্ষীরোদসাগরে নিদ্রিত নন। নরের মাঝে আজ তাঁহার অপূর্ব্ব মুক্তি-কাঙাল বেশ। ঐ শোনো, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝনৎকার। তাহারা শৃঙ্খল-মুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। ঐ শোনো মুক্তি-পাগল মৃত্যুঞ্জয় ঈশানের মুক্তি-বিষাণ! ঐ শোনো মহামাতা জগদ্ধাত্রীর শুভ শঙ্খ! ঐ শোনো ইস্‌রাফিলের * শিঙ্গায় নব-সৃষ্টির উল্লাস-ঘন রোল! ঐ যে ভীম রণ-কোলাহল, তাহাতেই মুক্তি-কামী দৃপ্ত তরুণের শিকল টুটার শব্দ ঝন ঝন করিয়া বাজিতেছে!

* ইস্‌রাফিল—প্রলয়-শিঙ্গা-মুখে অপেক্ষমান স্বর্গীয় দূত।

সাগ্নিক ঋষির ঋক্-মন্ত্র আজ বাণী লাভ করিয়াছে অগ্নি পাথারের অগ্নি-কল্লোলে। আজ নিখিল উৎপীড়িতের প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে ঐ মন্ত্র-শিখার পরশ পাইয়া। আজ তাহারা অন্ধ নয়, তাহাদের চোখের উপরকার কৃষ্ণ পর্দ্দা তীব্র বহ্নি-ঘাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের নয়নে আজ মুক্তজ্যোতিঃ বিস্ফুরিত। আজ নূতন করিয়া—মহা গগনতলে দাঁড়াইয়া ঐ অনাদি অসীম মুক্ত শূন্যতার পানে তাহারা চাহিয়া দেখিয়াছে, কোথায় সে অনন্তমুক্তি, আর কোথায় তাহারা পড়িয়া বন্ধন-জর্জ্জরিত। নরে আর নারায়ণে আজ আর ভেদ নাই। আজ নারায়ণ মানব। তাঁহার হাতে স্বাধীনতার বাঁশী। সে বাঁশীর সুরে সুরে নিখিল মানবের অণুপরমাণু ক্ষিপ্ত হইয়া সাড়া দিয়াছে। আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে—"পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী!" এ সুর নবযুগের। সেই সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর রুষিয়া শুনিয়াছে, আয়র্ল্যাণ্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,—জর্জ্জরিত, নিপীড়িত শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।

ভারত যেদিন জাগিল, সেদিন নিজের পানে চাহিয়া সে নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সেদিন সর্ব্বাপেক্ষা অপমানিত পদানত ঘৃণ্য সে। কতশত বর্ষের কত সহস্র শৃঙ্খলের কত লক্ষ বাঁধনই না মোচড় খাইয়া খাইয়া দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে—তাহার অস্থি পঞ্জর ভেদ করিয়া মর্ম্মেরও মর্ম্মস্থলে! কত গোলা, কত গুলি, কত বল্লম, কত তলোয়ারই না তাহার বুক ঝাঁজরা করিয়া দিয়াছে! পৃষ্ঠে তাহার নিষ্করুণ বেত্রাঘাত ও দুর্বিনীত পদাঘাতের দুর্বিসহ বেদনা-ঘা। গর্দ্দানে তাহার নির্দ্দয় খামখেয়ালী পশুশক্তির বিপুল জগদ্দল শীলা। চক্ষে তাহার সাতপুরু

করিয়া কাপড় বাঁধা। যেই সে গা মোড়া দিয়া উঠিল, অমনি তাহার আগেকার কাঁচা ঘায়ে সপাং সপাং করিয়া জল্লাদের লৌহ-হস্তের কাঁটার চাবুক বসিল। অসহনীয় সে নির্ম্মম অপমানে সে যখন ক্ষিপ্তের মত হাত পা ছুঁড়িয়া গর্দ্দানের বোঝা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শির উঁচু করিয়া তাকাইল, তখন কসাইএর ভোঁতা ছোরা দিয়া কচ্‌লাইয়া কচ্‌লাইয়া তাহার প্রাণপ্রিয় সন্তানগুলিকে তাহারই বুকের উপর রাখিয়া হত্যা করা হইল। হা হা করিয়া যখন মা তাহার বাছাদের রক্ষা করিতে গেল, তখন তাহারই দলিত শিশুর কলিজা মথিত রক্তের বিপুল ঝাপ্‌টা তাহার মুখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। সেই সন্তানের রক্ত-মাখানো দৃষ্টি দিয়া সে জল ভরা চোখে দেখিল, পূর্ব্বতোরণে অগ্নিরাগে লেখা রহিয়াছে "নবযুগ।" নয়ন দিয়া তাহার হু হু করিয়া অশ্রুর শত পাগল-ঝোরা ছুটিল। সে তাহার কোলের কাটা সন্তানের মুণ্ড ফেলিয়া দুই ব্যগ্র বাহুর ব্যাকুল আলিঙ্গন মেলিয়া নবযুগকে আহ্বান করিল, 'তুমি এস!' নবযুগ সেই ব্যাকুল কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পায়ে মাথা রাখিয়া বলিল, "আর আমায় ছাড়িও না মা। এমনই করিয়া যুগে যুগে আমায় আহ্বান করিয়ো!"

আবার দূরে সেই সর্ব্বনাশা বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিল। রুষিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা-বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন। মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই "খোদার উপর খোদকারী"-শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর!" "আল্লাহু আকবর"* বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য

* আল্লাহ আকবর—ঈশ্বর মহান।

নত শিরে আবার অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের* রক্ত-রাগ স্বাধীনতাপহারীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। শিথিল মুষ্টির ভূলুণ্ঠিত রবার আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবেনা। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম-শিখায় যদি কেহ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব। এমন সময় ভারত জাগিল। এত দিনে ভারতের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ আঁখি মেলিয়া চাহিলেন। ভারত ব্যাপিয়া হর্ষ-বাণীর মহাকল্লোল কলকল নিনাদে ধ্বনিত হইল "আবিরাবির্ম্মএধি"† আবির্ভাব হও! আবির্ভাব হও!! সারা বিশ্ব কান পাতিয়া সে মুক্তি-কল্লোল শুনিল। যুগাবতারের কাঙাল বেশে করুণ নয়ন পাতে সারাবিশ্বের আর্ত্ত-নিখিলের বন্ধন-কাতরতা আর মুক্তি-লিপ্সা মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিল। একই দুঃখে আজ দুঃখী জনগণ দেশ জাতি সমাজের বহির্ব্বন্ধন ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিল। আজ তাহারা এক, তাহারা একই ব্যথায় ব্যথিত নিপীড়িত সত্য মানবাত্মা। আজ কেহ কাহাকেও বাহির হইতে দেখে নাই। অন্তর দিয়া পরস্পরের বন্ধন-বেদনাতুর অন্তর দেখিয়াছে। তাহাদের উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত রবে—ঐ দেখ—বুঝি বন্ধন-প্রয়াসীর মুখ কালো হইয়া গেল হস্ত মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল।

ঐ শোন নবযুগের অগ্নিশিখ নবীন সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বাণী। ঐ বাণীই রণক্লান্ত সৈনিককে নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ঐ শোনো

---

* ফেজ—তুর্কীসৈনিকের রক্ত-শিরস্ত্রাণ

† আবিরাবির্ম্মএধি—আবির্ভাব হও!

তরুণ কণ্ঠের বীরবাণী,—আমাদের মধ্যে ধর্ম্মবিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণবিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য-অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের এই মুক্তি-কামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি। পরস্পর পরস্পরকে ভাই বলিয়া, একই অবিচ্ছিন্ন মহাত্মার অংশ বলিয়া অন্তরের দিক হইতে চিনিয়াছি। এই রক্ত-সমাধি পাশে দাঁড়াইয়া আমরা যেন সব স্বার্থ ভুলিয়া যাই। একই বিশ্বে একই বিশ্বমাতার বড় ছোট ভাই বলিয়া যেন করুণা ধারায় আমাদের বুক সিক্ত হইয়া, ভরিয়া ওঠে। আজ এ মহামিলনে যেন এতটুকু দীনতা থাকে না। এই মহা মানবের সাগরতীরে শ্মশান-বেলায় আমাদের এই যুগ-বাঞ্ছিত মহামিলন পবিত্র হউক, শাশ্বত হউক।

দাঁড়াও জন্মভূমি জননী আমার! একবার দাঁড়াও!! যেদিন তুমি সমস্ত বাধা বন্ধন মুক্ত, মহা-মহিমময়ী বেশে স্বাধীন বিশ্বের পানে অসঙ্কোচ-দৃষ্টি তুলিয়া তাকাইবে, সে দিন যেন নিজের এই ক্ষতবিক্ষত অঙ্গ ঝাঁজরাপারা বক্ষ, সুত-শোণিত-লিপ্ত ক্রোড় দেখিয়া কাঁদিয়োনা! তোমার পুত্র-শোকাতুর বুকের নিবিড় বেদনা সে দিন যেন উছলিয়া উঠেনা মা! সে দিন তুমি তোমার মুক্ত শিশুদের হাত ধরিয়া বিশ্বমঞ্চে বীরপ্রসূ জননীর মত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়ো। ঐ দুর সাগর-পার হইতে তোমার মুখে সে দিন যেন নব প্রভাতের তরুণ হাসি দেখি। যে বীর পুত্র তাহার তরুণ অসমাপ্ত জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা তোমার মুক্তির জন্য বলিদান দিয়া বিদায় লইয়াছে, সে দিন তাহাকেই হয়ত তোমার বেশী করিয়া মনে পড়িবে। কিন্তু সে দিন আর চোখের জল ফেলিয়োনা মা। বুক-জোড়া হাহাকার তোমার সে দিন কোলের সন্তানদেরে দেখিয়া ভুলিতে চেষ্টা করিয়ো!

এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বুদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান। আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সঙ্কীর্ণতা সব মিথ্যা সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহা শয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান ঐ শ্মশান ভূমিতে—শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ* ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই সে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়োনা, ভুলিয়োনা! আজ আর কলহ নয়, আজ আমাদের ভাই-এ ভাই-এ বোনে বোনে মায়ের কাছে অনুযোগের আর অভিযোগের এই মধুর কলহ হইবে যে, কে মায়ের কোলে চড়িবে আর কে মায়ের কাঁধে উঠিবে।

---

* শহীদ—Martyr ("শহীদ" শব্দের ঠিক বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ নেই। দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য যে প্রাণ দেয় সে-ই শহীদ)

"গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ' !"

——:০:——

স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ-মুখো হইয়া কোন অজানা পাষাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম, তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈব-বাণীর মতই দিকে দিকে বিঘোষিত হইল, "গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ' !" বাস্তবিক, আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব, এরূপ কোন কথা নাই। কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না। আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা ভুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার জাঁতায় পিষ্ট করিতেছে তাহারাও চিরকাল স্বাধীন ছিল না। শক্তি লাভ করিয়া যাহারা শক্তির এমন অপব্যবহার করিতেছে, কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্ম্মম হইয়া লিখিয়া রাখিছে! "এয়সা দিন নেহি রহেগা", চিরদিন কারুর সমান যায় না। আজ যে কপর্দ্দকহীন ফকির, কাল তাঁহার পক্ষে বাদশাহ্ হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। আজ আমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহার প্রকৃতি-দত্ত স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব ও সম্মানকে হনন করিতেছি, কাল যে সেই আবার

আমারই মাথায় পদাঘাত করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? শক্তি-সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।

অন্যকে কষ্ট দিয়া তাহার "আহা-দিল"* নিতে নাই, বেদনাতুরের আন্তরিক প্রার্থনায় আল্লার আরশ † টলিয়া যায়। শক্তির অপ-ব্যবহারের জন্য রোম সাম্রাজ্য গেল, জার্ম্মাণীর মত মহা শক্তিরও পরাজয় হইল। কত উত্থান, কত পতন এই ভারত দেখিয়াছে, দেখিতেছে এবং দেখিবে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিবেক সর্ব্বদাই মানবের পশু-শক্তিকে সতর্ক করিতেছে। বিবেকের ক্ষমতা অসীম, যাহারা পশু-শক্তির ব্যবহার করিয়া বাহিরে এত দুর্ব্বার দুর্জ্জয়, অন্তরে তাহারা বিবেকের দংশনে তেমনি ক্ষত-বিক্ষত, অতি দীন। তাহারা তাহাদের অন্তরের নীচতায় নিজেই মরিয়া যাইতেছে, শুধু লোক-লজ্জায় তাহাকে দাম্ভিকতার মুখোস পরাইয়া রাখিয়াছে। সিংহের চামড়ার মধ্য হইতে লুকানো গর্দ্দভমূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়িবেই। নীল শৃগালের ধূর্ত্তামি বেশী দিন টিকেনা। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জ্জন না দিই। আজ যখন সমস্ত বিশ্ব মুক্তির জন্য, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য উন্মাদের মত সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, স্বাধীনতা যজ্ঞের হোমানলে আবালবৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়াইয়া দিতেছে, তাহাদের মুখে শুধু এক বুলি, "মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি" হস্তে তাহাদের মুক্তির নিশান—মুখে তাহাদের মুক্তির বিষাণ, শিয়রে তাহাদের মুক্তির তৃপ্তি-ভরা মহা-গৌরবময় মৃত্যু,—তখনও, মুক্তির সেই যুগান্তরের নবযুগেও,

---

* আহা-দিল—যন্ত্রণা পেয়ে ব্যথিত নিশ্বাস আর নীরব অভিযোগ।

† আরশ—ভগবানের সিংহাসন

আমরা কিনা পলে পলে দাসত্বের, মনুষ্যত্ব-হীন আত্ম-সম্মানশূন্য ঘৃণ্য কাপুরুষের মত অধোদিকেই গড়াইয়া চলিতেছি! এতদূর নীচ হইয়া গিয়াছি আমরা যে, কেহ এই কথা বলিলে উল্টো আবার কোমর বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দিই। আমাদের এই তর্কের সব চেয়ে সাধারণ সূত্র হইতেছে, দাসত্ব গোলামী ছাড়িয়া দিলে খাইব কি করিয়া? কি নীচ প্রশ্ন! যেন আমাদের শুধু কুকুর বিড়ালের মত উদর-পূর্ত্তির জন্যই জন্ম! এমন নীচ অন্তঃকরণ লইয়া যাহারা বেহায়ার মত বেহুদা* তর্ক করিতে আসে, তাহাদের উপর খোদার বজ্র কেন যে ভাঙিয়া পড়ে না, তাহা বলিতে পারি না! আজ সারা বিশ্ব যখন ও-রকম মরার মত বাঁচিয়া থাকার চেয়ে মরিয়া মুক্তিলাভের জন্য প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে, তখনও আমাদের এই রকম হৃদয়-হীনতার, গোলামী মনের পরিচয় দিতে এতটুকু লজ্জা হয় না! বড়ই দুঃখে তাই বলিতে হয়, "এ অভাগা দেশের বুকে বজ্র হানো হানো প্রভু, যদ্দিনে না ভাঙছে মোহ-ভার!" আমাদের এ মোহ-ভার ভাঙবে কে? এ শৃঙ্খল মোচন করিবে কে? আছে, উত্তর আছে, এবং তাহা, "আমরাই!" নির্ব্বোধ মেষ-যূথের মত এক স্থানে জড় হইয়া শুধু মাথাটা লুকাইয়া থাকিলেই নেকড়ে বাঘের হিংস্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইব না, তাহা হইলে আমাদেরে ঐ নেকড়ে বাঘের মত করিয়া কান ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করিবে।

দেশের পক্ষ হইতে আহ্বান আসিতেছে, কিন্তু কাজে আমরা কেহই সাড়া দিতে পারিতেছি না। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কি করিতেছে আগে দেখাও, তারপর আমাদিগকে বলিও। এ প্রশ্ন

* বেহুদা—বাজে।

ফাঁকিবাজের প্রশ্ন। দেশ-মাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন, যাহার বিবেক আছে কর্ত্তব্য-জ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে সেই বুক বাড়াইয়া আগাইয়া যাইবে। তোমার কি নিজের ব্যক্তিত্ব নাই যে, কে কি করিল আগে দেখিয়া তবে তুমি তার পিছু পিছু পা ধরিবে? নেতা কে? বিবেকই তো তোমার নেতা, তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞানই তো তোমার নেতা! দেশ-নায়ক যাঁহারা, তাহারা তো তোমার বিবেকেরই প্রতিধ্বনি করেন। কর্ত্তব্যজ্ঞানের কাছে, ত্যাগের কাছে সম্ভব অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং 'ইহা সম্ভব উহা অসম্ভব' বলিয়া,ছেলে-মানুষি করাও আর এক বোকামি। যাহা সম্ভব তাহা করিবার জন্য তোমার ডাক পড়িত কি জন্য? অসম্ভব বলিয়াই তো দেশ তোমার বলিদান চাহিয়াছে! স্বার্থের গণ্ডি না পারাইয়া ভিক্ষা দেওয়া যায়, ত্যাগ বা বলিদান দেওয়া যায় না। তোমার যতটুকু শক্তি আছে প্রয়োগ কর, দেশের কাছে খোদার কাছে অসঙ্কোচে দাঁড়াইবার পাথেয় সঞ্চয় কর, তোমার বিবেকের কাছে তুমি অগাধ শান্তি পাইবে! ইহাই তোমার পুরস্কার। অন্যে জাহান্নমে যাইবে বলিয়া কি তুমিও তার পিছু পিছু সেখানে যাইবে?

আজ আমাদের শুধু ক্লান্তি,—শুধু শ্রান্তি কেন? "এমন করে" ক'দ্দিন খাবি, না "গোলেমালে যদ্দিন যায়" করে' আর কতদিন চলিবে? আমরা আমাদের দেশের জন্য, মুক্তির জন্য কি দুঃখ দৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না? ত্যাগ, বিসর্জ্জন, উৎসর্গ বলিদান ছাড়া কি কখনও কোনো দেশ উদ্ধার হইয়াছে, না হইতে পারে? স্বার্থত্যাগ করিতে হইলে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে, ত্যাগ কখনো আরাম-কেদারায় শুইয়া হয় না। কিন্তু এই দুঃখ কষ্ট, ইহা ত বাহিরের; একটা সত্য মহান্ পবিত্র কার্য্য করিতে গেলে যে আত্মতৃপ্তি অনুভব করা যায়, অন্তরে যে ভাস্বর স্নিগ্ধ

দীপ্তির উদয় হইয়া সকল দেহ-মন আলোয় আলোকময় করিয়া দেয়, সারা দেশের ভাইদের বোনদের যে প্রশংসা-ভরা স্নেহ-কল্যাণময় অশ্রু-কাতর দৃষ্টি ও সারা মুক্ত বিশ্বের সাবাসি পাওয়া যায়, তাহা এই বাহিরের দুঃখ কষ্টকে কি ঢাকিয়া দিতে পারে না? কার মূল্য বেশী? বাহিরের এই নগণ্য দুঃখ কষ্টের, না অন্তরের স্বর্গীয় তৃপ্তির? তুমি কি চাও? কুকুর বিড়ালের মত ঘৃণ্য-মরা মরিতে, না মানুষের মত মরিয়া অমর হইতে? তুমি কি চাও? শৃঙ্খল না স্বাধীনতা? তুমি কি চাও? তোমাকে লোকে মানুষের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মত মুখে লাথি মারুক? তুমি কি চাও? উষ্ণীষ-মস্তকে উন্নত-শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মত গৌরব দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জ পৃষ্ঠে গোলামের মত অবনত হইয়া হুজুরীর মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নমে যাও! তোমার সারমেয় গোষ্ঠি লইয়া খাও দাও আর পা চাট! আর, যাহারা ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, যাহারা ঘরে মুখ মলিন দেখিয়া গলিয়া যাইবে না, যাহাদের জান দিবার মত গোর্দ্দা* আছে, আঘাত সহিবার মত বুকের পাটা আছে, তাহারা বাহির হইয়া আইস! দেশ-মাতার দক্ষিণ হস্ত আর কল্যাণ-মন্ত্রপূত অশ্রু-পুষ্প তোমাদেরই মাথায় ঝরিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমরা চাই লাঞ্ছনার চন্দনে আমাদের উলঙ্গ-অঙ্গ অনুলিপ্ত করিতে! কল্যাণের মৃত্যুঞ্জয় কবচ আমাদের বাহুতে উষ্ণীষে বাঁধা, ভয় কি? মনে পড়ে, সে-দিন দেশ-মাতার আহ্বান নিয়ে মাতা সরলা দেবী বাঙ্গলার কন্যারূপে পাঞ্জাব হ'তে সামাজিক চাইতে এসেছিলেন। কে কে

* গোর্দ্দা—হৃদপিণ্ড অর্থাৎ অসম সাহস।

সাড়া দিলে এ জাগ্রত মহা-আহ্বানে? এমন ডাকেও যদি সাড়া না দাও, তবে জানিব তোমরা মরিয়াছ। বৃথাই এ আহ্বান,এ ক্রন্দন তোমার মা! যদি পার, সঞ্জীবনী সুধা লইয়া আইস তোমার এ মরা সন্তান বাঁচাইতে। যদি তাহা না পার, তবে ইহাদিগকে ধুতুরার বীজ খাওয়াইয়া পাগলা করিয়া দাও। ইহাতে তাহারা "মানুষের মত" জাগিবে না, কিন্তু তবু জাগিবে! জানি, কুপুত্র অনেকে হয়, কুমাতা কখনো নয়; কিন্তু আর এমন করিয়া স্নেহের প্রশ্রয় দিলে চলিবে না মা, এখন তোমাকে কু-মাতা হইতে হইবে, তোমাকেই আঘাত দিয়া আমাদের জাগাইতে হইবে। আমরা পরের আঘাত চোখ বুজিয়া সহ্য করি, কিন্তু স্বজনের আঘাত সইতে পারি না। তাই আর শুধু ডাকাডাকিতে কোন ফল হইবে না। তোমার রুদ্র মূর্ত্তি দিকে দিকে প্রকটিত হউক! যদিই এই রুদ্র ভীষণতার মধ্যে রণ-চণ্ডীর মহামারীর মধ্যে আমাদের মনুষ্যত্ব জাগে, যদি আঘাত খাইয়া খাইয়া অপমানিত অবমানিত হইয়া আবার আমরা জাগি। তাই আবার বলিতেছি, তোমরাও সাথে সাথে বল,

"গেছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ!"

—০—

ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ

আমাদের হিন্দুস্থান যেমন কীর্ত্তির শ্মশান, বীরত্বের গোরস্থান, তেম্‌নি আবার তাহার বুক অত্যাচারী আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। সেই সব আঘাতের কীর্ত্তিস্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষ দুনিয়ার মুক্তবুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যত কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের সব কিছুরই স্মৃতিস্তম্ভ আমাদের চোখে শূলের মত বাজিতেছে। কিন্তু এই যে সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মত আমাদের সাম্‌নে জাগিয়া থাক্, ইহা খুব ভাল কথা,—কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন্ ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহায় চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে কোন প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত্ত হইয়া চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কসাইএর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদেরই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ

আমাদের নূতন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে ?—ডায়ার।

মানুষের, জাতির, দেশের যখন চরম অবনতি হয়, তখনই এইরূপ নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। মানুষ যখন নিজের প্রকৃতিদত্ত অধিকারের কথা ভুলিয়া যায়, শত বন্ধনের মধ্যে তাহার জীবনের গতি-চাঞ্চল্য হারাইয়া ফেলে, তখন তাহার আর মান অপমান জ্ঞান থাকে না, প্রভুর দেওয়া দয়ার দানকে গোলামের মত সে মহাদান বলিয়া মাথায় তুলিয়া বরণ করিয়া লয় এবং তাহার ভৃত্য-জীবন সার্থক হইল মনে করে। তাহার মন এত ছোট হইয়া যায়, তাহার আশা এত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে যে, সে ভাবিতেও পারে না – যে দান মাথায় করিয়া আজ সে গৌরব অনুভব করিতেছে, যে দানকে সে শিরোপা* করিয়া (অভিরুচি অনুসারে কখনও পেছনে নেজুড়ের মত জুড়িয়া) মুক্ত স্বাধীন বিশ্বের কাছে বক্ষস্ফীত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার দাম এক কথায় "পাঁচ জুতি"!

মনুষ্যত্বের এ অবমাননা ও লাঞ্ছনা শুধু ভিক্ষুকের জাতিই হাসিমুখে নিজেদের গৌরব বলিয়া মানিয়া লইতে পারে। অন্তরে যাহারা ঘৃণ্য নীচ আর ছোট হইয়া গিয়াছে, আত্মসম্মান-জ্ঞান যাহাদের এত অসাড় হিম হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিতে চাই—এই ডায়ারের দেওয়া অপমানের মত বজ্র-বেদন।

এই ডায়ারের মত দুর্দ্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মত করিয়া না মারিত তাহা হইলে কি আজিকার মত আমাদের এই হিম-নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত,

* শিরোপো—পুরস্কার

—না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মত গর্জ্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না। আজ আমাদের সত্যিকার শোচনীয় অবস্থা সাদা চোখে দেখিতে পারিয়াছি এই ডায়ারেরই জন্য। ডায়ারের প্রচণ্ড পদাঘাত, পৈশাচিক খুনখারাবী আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া আমাদের ঘৃণ্য হীন অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছে। আরো জানাইয়া দিয়াছে যে,—যে নিষ্ঠীবন মাথায় করিয়া, প্রভুর-দেওয়া যে চাপ্‌রাস পরিয়া, যে ছিন্ন জুতার মালা গলায় দুলাইয়া আমরা আহাম্মকের মত দুনিয়ার স্বাধীন জাতিদের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া—গোলামীর ঝুটা গৌরব দেখাইতে গিয়া শুধু হাস্যাস্পদ হইয়াছিলাম, তাহাতে কেহ আমাদের প্রশংসাত করেই নাই, উল্টো আরো "হাট্ যাও গোলামকা জাত্" বলিয়া অবলীলাক্রমে লাঠির গুঁতো, বুটের টক্কর লাগাইয়াছে। তাহারা স্বাধীন,—আজাদ্; তাহারা আমাদের এ হীন নীচতা, এত হেয় ভীরুতা, এমন ঘৃণ্য কাপুরুষতাকে পা দিয়া মাড়াইয়া যাইবে না ত কি মাথায় তুলিয়া লইবে? অন্ধ আমরা, আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেছিলাম না,—সে অন্ধত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে এই ডায়ার! আমাদের এই নির্ল্লজ্জ কাপুরুষতা ভীম পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে এই জেনারেল ডায়ার! গোলামের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ কি রকম, ব্যবহার কি রকম, তাহাই সে নির্ম্মম কঠোরভাবে জানাইয়া দিয়াছে। অন্য প্রতারকদের মত গলায় পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া আদর দেখাইতে যায় নাই সে,—সে নারীর সাম্‌নে উলঙ্গ করিয়া মেথরের হাতে বেত্র দিয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়াছে! গর্দ্দানে পাথর চাপা দিয়া বুকের উপর হাঁটাইয়াছে, তাহাদের পায়ে তোমাদিগকে সিজ্‌দা* করাইয়া ছাড়িয়াছে।—আর, তবে তোমরা

* সিজ্‌দা—সাষ্টাঙ্গ প্রণতি।

জাগিতে পারিয়াছ! তোমাদিগকে জাগাইতে চাই এম্‌নি প্রচণ্ড নির্ম্মম কসাই শক্তি! এত নির্ম্মমভাবে, এমন পিশাচের মত বেত্রাঘাত না করিলে তোমরা জাগিতে না,—তোমার মা বোনেদের সাম্‌নে এম্‌নি উলঙ্গ করিয়া হাত পা বাঁধিয়া পশুর মত না পিটাইলে তোমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না! ডায়ারের বুট এমন করিয়া তোমাদের কলিজা মথিত না করিয়া গেলে তোমাদের চেতন হইত না! তোমার মুখের সাম্‌নে তোমার আত্মীয় আত্মীয়ার মুখে এম্‌নি করিয়া থুথু না দিলে তোমার মানব-শক্তি ক্ষেপিয়া উঠিত না!—তাই আজ আমরা ডায়ারকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, "খোদা তোমার মঙ্গল করুন!" তুমি যে মঙ্গল দিয়া গিয়াছ আমাদের সারা ভারতবাসীকে, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না, আমরা নিমকহারামের জাতি নই। নিশ্চয়ই তুলিব তোমার স্মৃতিস্তম্ভ, মহৎ প্রতিহিংসারূপে নয়, প্রতিদান স্বরূপে। আজ আমাদের এ মিলনের দিনে তোমাকে ভুলিলে ত পারিব না ভাই! এই মহামানবের সাগরতীরে ভারতবাসী আজ জাগিয়াছে—বড় সুন্দর মোহন মূর্ত্তিতে জাগিয়াছে! সেই তোমার আনন্দের হত্যার দিনে, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হতভাগাদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান দুইভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে। দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন সত্যিকার মিলন হয়। আজ আমাদের এ মিলন যে স্বার্থের উপর ভিত্তি করিয়া নয় ভাই, আজ আমরা পরস্পর পরস্পরকে সমান ব্যথায় ব্যথী, একই মায়ের পেটের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছি। কাঁদিয়াছি—গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়াছি!—আমাদের ভাইদের খুন-মাখানো সমাধির উপর দাঁড়াইয়া আমরা এক ভাই অন্য ভাইকে চিনিয়াছি, আর বড় প্রাণ ভরিয়াই গাহিয়াছি—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
এমন ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই
কদিন থাকে!"

আজ এস ডায়ার, আমাদের এই মহা-মিলনের পবিত্র দৃশ্য দেখিতে তোমাকেও নিমন্ত্রণ করিতেছি। আজ ঈর্ষা দ্বেষ ভুলিয়া গিয়াছি ভাই, তোমারও জন্য আমাদের বুকের আসন পাতা রহিল।

এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ ক্লেশ অনেক ব্যথা বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় দুঃখের, বড় কষ্টের ভাই! খোদা যখন আমাদের জাগাইয়াছেন, তখন আর যেন আমরা না ঘুমাই যদি এতটুকু ঘুমের 'খোমার'* আসে তবে যেন এই ডায়ারকে স্মরণ করিয়া আবার আমরা হুঙ্কার দিয়া খাড়া হইতে পারি, ডায়ার-স্মৃতি-স্তম্ভের ঐ আকাশের মর্ম্ম-ভেদী চূড়া দেখিয়া যেন মনুষ্যত্বের শক্তির সাড়া আমাদের মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠে। আমাদের এ মিলন যদি মিথ্যা হয়, তবে যেন আমা-দিগকে সচেতন করিতে যুগে যুগে এই ডায়ারের বজ্র বেদনার আবির্ভাব হয়।—আমাদের প্রীতির বন্ধন অক্ষয় হোক্। আমাদের এ মহামিলন চিরন্তর হোক্। আমরা আজ সব সঙ্কীর্ণতা অতীতের সকল দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া ভাইকে ভাইএর কোল বাড়াইয়া দিই। এস ভাই, আর একবার হাত ধরাধরি করিয়া এই খোলা আকাশে মুক্ত মাঠে দাঁড়াই।

---

* খোমার—তন্দ্রা।

ধর্ম্মঘট

দেশে একটা প্রবাদ আছে, "যে এলো চষে' সে রইলো বসে, নাড়াকাটাকে ভাত দাও এক থালা কসে'।" হুলের দংশন জ্বালা যথেষ্ট থাকলেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্বয়ং "নাড়া-কাটা" প্রভুরাও এ কথাটা ভাল করিয়াই বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও যে না বুঝিবার ভাণ করেন বা প্রতিকারের জন্য নিজেদের দারাজ দস্ত্ সাম্‌লাননা, ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমাদের মনুষ্যত্বে বিবেকে আঘাত লাগে এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা তুলিলেই হইল "ধর্ম্মঘট"। চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনৎ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায়না; হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত একটা টেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরাণ পরা সারা-জীবনেও ঘটিয়া উঠেনা, ছেলে মেয়ের সাদ-আরমান মিটাইতে পায়না, অথচ তাহারই ধান চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারমাসে তেত্রিশ পার্ব্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন! কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচেনা; তাহারা দিবারাত্রি খনির নীচে পাতাল পুরিতে আলো বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধুঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানী তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন কিন্তু এ-হতভাগাদের স্বাস্থ্য আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও

* দারাজ দস্ত্—বিপুল হস্ত
সাদ-আরমান—সাধ ইচ্ছা

চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক ফেরৃতা বীভৎস নর-কঙ্কাল! দোষ কাহাদের? কর্ত্তাদের মতে দোষ অবশ্য এই হতভাগাদেরই। কারণ পেট্ বড় 'মুদ্দই' এবং পেটের জন্যই ইহারা এমন করিয়া আত্মহত্যা করে!

আমরা মাত্র এই দুই একটি নজির দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দেশের সমস্ত কল কারখানায় আড়তে গুদামে "ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার" এই রূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন। আমাদের ক্ষমতা নাই যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিয়া বলি। যাঁহারা ঐ সব কল কারখানায় পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে এতটুকুও সংশ্লিষ্ট আছেন বা একদিনের জন্যও ওদিক মাড়াইয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের এই বর্ণনার চেয়ে এর সত্যতা কতগুণ বেশী বুঝিতে পারিবেন। আজকাল বিশ্ব-মানবের মধ্যে Larger humanity বলিয়া যে একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়াছে, এই কল-কারখানার অধিকাংশ কর্ত্তা বা কর্ত্তৃপক্ষেরই সে দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চোখের সাম্‌নে রাত্রিদিন মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত কত অমানুষিক পাশবতা তাঁহাদেরই এই সব কারখানায় আড়তে অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বাক্ নিশ্চল! নিজেরা মজা-সে আকণ্ঠ ভোগের মধ্যে থাকিয়া কুলি মজুরদের আবেদন নিবেদনকে বুটের ঠোক্কর লাগাইতেছেন! সবারই অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব আত্ম-সম্মানের স্থূল সংস্করণরূপে নিদ্রিত থাকে, যেটা খোঁচা খাইয়া খাইয়া জর্জ্জরিত না হইলে মরণ-কামড় কামড়াইতে আসে না। কিন্তু ইহাতে এই মনুষ্যত্ব-বিহীন ভোগ-বিলাসী

* মুদ্দই—শত্রু

কর্ত্তার দল ভয়ানক রুষ্ট হইয়া উঠেন, তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন না যে, এ অভাগাদের বেদনার বোঝা নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই তাহাদের এ-বিদ্রোহের মাথা-ঝাঁকানি। উন্নত আমেরিকা ইউরোপেই ইহার প্রথম প্রচলন। সেখানে এখন লোকমতের উপরই শাসন প্রতিষ্ঠিত, এই গণতন্ত্র বা ডিমোক্র্যাসিই সেদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা; তাই শ্রমজীবিদলেরও ক্ষমতা সেখানে অসীম। তাহারা যে রকম মজুরি পায়, তাহাদের স্বাস্থ্যশিক্ষা আহার বিহার প্রভৃতির যে রকম সুখ সুবিধা, তাহার তুলনায় আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণের অবস্থা কশাইখানার পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। তাই এতদিন নির্ব্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার অবিচার সহিয়া সহিয়া শেষে যখন আজ রক্তমাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই বুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট-জর্জ্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরের এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা Sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ কত বেশী অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ধর্ম্ম-ঘটের আগুন এখন দাউ দাউ করিয়া সারা ভারতময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং ইহা সহজে নিভিবার নয়, কেননা ভারতেও এই পতিত উপেক্ষিত নিপীড়িত হতভাগাদের জন্য কাঁদিবার লোক জন্মিয়াছে, এ দেশেও মহত্ত্বর মানবতার অনুভব সকলেই করিতেছেন। সুতরাং শ্রমজীবিদলেরও সেই সঙ্গে তথা-কথিত গণতন্ত্রও ডিমোক্র্যাসীর জাগরণও এ দেশে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং পড়িবে। কেহই উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ক্রমেই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং করিবে। এ ধর্ম্মঘট ক্লিষ্ট মুমূর্ষু জাতের শেষ কামড়, ইহা বিদ্রোহ নয়।

লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে
বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য।

(স্মৃতি)

আজ মনে পড়ে সেইদিন আর সেই ক্ষণ—বিকাল আড়াইটা যখন কলিকাতার সারা বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘ টাউনহলের খিলাফৎ আন্দোলন সভায় তাহাদের বুকভরা বেদনা লইয়া সম্রাটের-সম্রাট বিশ্বপিতার দরবারে তাহাদের আর্ত্ত-প্রার্থনা নিবেদন করিতেছিল, আর পুত্রহীনা জননীর মত সারা আকাশ জুড়িয়া কাহার আকুল-ধারা ব্যাকুলবেগে ঝরিতেছিল! সহসা নিদারুণ অশনিপাতের মত আকাশ বাতাস মন্থন করিয়া গভীর আর্ত্তনাদ উঠিল,—"তিলক আর নাই!" আমাদের জননী জন্মভূমির বীরবাহু, বড় স্নেহের সন্তান—"তিলক আর নাই!" হিন্দুস্থান কাঁপিয়া উঠিল—কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! ওরে, আজ যে তাহার বুকে তাহারই হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ধসিয়া পড়িল! হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে কোন্ প্রিয়তম-পুত্রহারা অভাগী মাতার মর্ম্মবিদারী কাৎরানি আর বুকচাপড়ানি রনিয়া রনিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, "হায় মেরি ফরজন্দ (হায় আমার সন্তান) আহ্ মেরি বেটা!" এই আর্ত্তকান্নার রেশ্ যখন কলিকাতায় আসিয়া প্রতিধ্বনি তুলিল, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই! এত মর্ম্মভেদী কান্না প্রকাশের ভাষা নাই—ভাষা নাই! মহাবাহু মহাপুরুষ অগ্রজের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ

ভ্রাতারা যেমন প্রাণ ভরিয়া গলা-ধরাধরি করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে, সেদিন দিন-শেষে ব্যাকুল বৃষ্টিধারার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা তেমনি করিয়া কাঁদিয়াছি! হিন্দু-মুসলমান,—মাড়োয়ারী, বাঙালী,—হিন্দুস্থানী কোন ভেদাভেদ ছিল না, কোন জাতবিচার ছিল না,—তখন শুধু মনে হইতেছিল, আজ এই মহাগগনতলে দাঁড়াইয়া আমরা একই ব্যথার ব্যথিত বেদনাতুর মানবাত্মা, দুটি স্নেহ-হারা ছোট ভাই! এখানে ভেদ নাই—ভেদ নাই! সেদিন আমাদের সে কান্না দেখিয়া মহাশূন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে—ঝাঁজ্‌রা আকাশের ঝন্না থামিয়া গিয়াছে,—শুধু সে-কার মেঘ-ভরা বেদনাপ্লুত অপলক দৃষ্টি আমাদের নাঙ্গাশিরে স্তব্ধ আনত হইয়া চাহিয়া থাকিয়াছে! তাই মনে হইতেছিল, বুঝি সারা বিশ্বের বুকের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে! এই স্তম্ভিত নিস্তব্ধতাকে ব্যথা দিয়া সহসা লক্ষকণ্ঠের ছিন্ন-ক্রন্দন **কার্‌বালা-মাতমের** (কারবালা-মাতম্ = কারবালার শোকোচ্ছ্বাস) মত মোচড় খাইয়া উঠিল, "হায় তিলক! হায় তিলক!!" ওরে, এ কোন্ অসহনীয় ক্রন্দন? হায়, কাহার এ রুদ্ধ-কণ্ঠের শ্রান্ত-রোদন?—মনে পড়ে, সমস্ত বড়বাজার ছাপাইয়া হ্যারিসন রোডের সমস্ত স্থান ব্যাপিয়া রোরুদ্যমান লক্ষ লক্ষ লোক—মাড়োয়ারী, বাঙ্গালী, হিন্দু মুসলমান, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, কন্যা—শুধু বুক চাপড়াইতেছে, 'হায় তিলকজি! আহ্ তিলকজি!' মৃত্যুর-অমা-ভরা শত শত কৃষ্ণ পতাকা পশ্চিমা-ঝঞ্ঝায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, আর তাহারই নিম্নে মাল্য-চন্দন-বিভূষিত বিগত তিলকের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! তাহাই কাঁধে করিয়া অযুত লোক চলিয়াছে, জাহ্নবীর জলে বিসর্জ্জন দিতে! বাড়ীর বারান্দায় জানালায় থাকিয়া আমাদের মাতা ভগিনিগণ এই পুণ্যাত্মার আলেখ্যের

উপর তাঁহাদের পূত অশ্রুরাশি ঢালিয়া ভাসাইয়া দিতেছিলেন! বলিলাম, ধন্য ভাই তুমি! এম্‌নি মরণ, সুখের মরণ, সার্থক মরণ যেন আমরা সবাই মরিতে পারি! তোমার চির-বিদায়ের দিনে এই শেষ আশীষ-বাণী করিয়া যাও ভাই, এম্‌নি প্রার্থিত মহামৃত্যু যেন এই দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর প্রত্যেকেরই হয়!······ওরে ভাই, আজ যে ভারতের একটি স্তম্ভ ভাঙিয়া পড়িল! এ পড়-পড় ভারতকে রক্ষা করিতে এই মুক্ত জাহ্নবীতটে দাঁড়াইয়া আয় ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান কাঁধ দিই! নহিলে এ ভগ্ন-সৌধ যে আমাদেরই শিরে পড়িবে ভাই! আজ বড় ভাইকে হারাইয়া, এই একই বেদনাকে কেন্দ্র করিয়া, একই লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়া যেন আমরা ভাইকে, পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করি! মনে রাখিও ভাই, আজ শ্মশানে দাঁড়াইয়া এ স্বার্থের মিলন নয়, এ মিলন পবিত্র, স্বর্গীয়! ঐ দেখ, এ মিলনে দেবদূতরা তোমাদের নাঙ্গা-শিরে পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছে। মায়ের চোখের জলেও হাসি ছল ছল করিতেছে!

মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?

—:*:—

আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেইদিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিশের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাড়ী নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে, তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও এক-জন আহত হয়! কোন্ মূর্খ বিশ্বাস করিবে একথা?

আমরা বলি,একটি আঘাতের বদলেই তিন তিন বার গুলি বর্ষণ করা, এ কোন্ সভ্য দেশের রীতি? তোমাদের ত সিপাহী-সৈন্যের অভাব নাই—বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই ত গেরেফতার করিয়া লইতে পারিতে। তা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি! আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের, স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল!

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইবনা, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের একহাজার

লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠা কাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদেরে কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি? এই যে সেদিন হতভাগারা হাজার বছরের পরিচিত, সারা জীবনের সুখ দুঃখ স্মৃতি বিজড়িত, বাপদাদার ভিটাবাড়ী আত্মীয় পরিজন জননীজন্মভূমির মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া, বড় দুঃখে বড় কষ্টে জীবনের সঙ্গে জড়ানো এইসব স্নেহ স্মৃতির বন্ধন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া এক মুক্ত স্বাধীন অজানার দিকে পাড়ী দিতেছিল, ইহাদের বেদনা বুঝিবার অন্তর তোমাদের আছে কি? মনুষ্যত্বের এই যে মস্তবড় একটা দিক, পরের বেদনকে আপন করিয়া নেওয়া,—ইহা কি আর তোমাদের আছে? স্বাধীনতাকে, মনুষ্যত্বকে এমন নির্ম্মম ভাবে দুই পায়ে মাড়াইয়া চলিবে আর কতদিন? এই অত্যাচারের, এই মিথ্যার বনিয়াদে খাড়া করা তোমাদের ঘর—মনে কর কি চিরদিন খাড়া থাকিবে? এই সব অপ-কর্ম্মের, এই সব অমার্জ্জনীয় পাপের, এই সব নির্ম্মম উৎপীড়নের জন্য বিবেকের যে দংশন তাহা হইতে তোমাদের রক্ষা করিবে কে? এ মহাশাস্তির ভীষণতা আজো কি তোমার চক্ষে পড়ে নাই? তোমাদের অত্যাচারে, জুলুমে নিপীড়িত হইয়া, মানবাত্মার—মনুষ্যত্বের এত পাশবিক অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া মানুষের মত যাহারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল যে, এখানে আর ধর্ম্ম কর্ম্ম চলিবে না, এবং চিরদিনের মত তোমাদের সংশ্রব ছাড়িয়া তোমাকে সালাম করিয়া বিদায় লইল,—সেই বিদায়ের দিনেও যাহাদের উপর সামান্য পশুর মত ব্যবহার করিতে তোমার লজ্জা হইল না, দ্বিধা হইল না? সামান্য খুঁটি নাটি ধরিয়া, ছল করিয়া গায়ে পড়িয়া তাহাদের সাথে

গোলমাল বাধাইলে, হত্যা করিলে? আবার হত্যা করিলে আমাদেরই ভারতীয় সৈন্য দ্বারা? যাহাকে হত্যা করিলে, তাহাকে হত্যা করিয়াও ছাড় নাই, তাহার লাশ তিন দিন ধরিয়া আটকাইয়া রাখিয়া পচাইয়া গলাইয়া ছাড়িয়াছ! মৃতের প্রতিও এত আক্রোশ, এত অসম্মান কেবল তোমাদের সভ্য জাতিই একা দেখাইতে পারিতেছে! তোমাদেরি কিচেনার—লর্ড কিচেনার মেহেদীর কবর হইতে অস্থি উত্তোলন করিয়া ঘোড়ার পায়ে বাঁধিয়া ঘোড় দৌড় করিয়াছে, তোমাদের এই সৈন্যদল যে তাহারই শিষ্য। না জানি আরো কত বাছাদের, আমাদের কত মা বোনেদের খুলি উড়াইয়াছ, তোমরাই জান। আমাদের যে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত স্বাধীন দেশে গিয়া পঁহুচিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পঁহুছিতে পারে না! সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল! মনে রাখিও, সে খোদার আরশের পায়া ধরিয়া ইহার দাদ্ (বিচার) মাগিতেছে! দাও, উত্তর দাও! বল তোমার কি বলিবার আছে!

বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান।

---:০:---

আমাদের বাঙ্‌লার মুসলমান সমাজ যে বাঙ্‌লাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীত ভাবে উন্নতি দেখাইতেছেন, ইহা সকলেই বলিবেন এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে। সাধারণ অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালী মুসলমানই এখন বাঙ্‌লা পড়িতেছেন, বাঙ্‌লা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা। বাঙ্‌লা সাহিত্যে পাকা আসন দখল করিবার জন্য সকলেরই মনে যে একটা তীব্র বাসনা জাগিয়াছে এবং ইহার জন্য আমাদের এই নূতন পথের পথিকগণ যে বেশ তোড়জোড় করিয়া লাগিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই সাহিত্যে আমাদের জীবনের লক্ষণ। ইহারই মধ্যে আমাদের কয়েকজন তরুণ লেখকের লেখা দেখিয়া আমাদের খুবই আশা হইতেছে যে, ইহারা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাইবেন।

এখন আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউ-ভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, যাহার প্রাণ নাই, সে নির্জ্জীব-সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা

ফুটিতে দেখা যায়। হইবে কোথা হইতে? সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি, যাহার নিজের প্রাণ নাই, যে নিজে জড় হইয়া গিয়াছে, সে লেখার প্রাণ দিবে কোথা হইতে? যাহার নিজের বুকে রঙএর আলিপনা ফুটে না, সে চিত্রে রঙ ফুটাইবে কেমন করিয়া? আমাদের অধিকাংশই হইয়া গিয়াছি জড়, কেননা আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে; তাহাতে না আছে কোন বৈচিত্র্য না আছে কোন সৌন্দর্য্য। তা ছাড়া, "বোঝার উপর শাকের আঁটির" মত আমরা নাকি আবার জন্ম হইতেই দার্শনিক, কাজেই বয়স কুড়ি পার না হইতেই আমরা গম্ভীর হইয়া পড়ি অস্বাভাবিক রকমের। আর, গম্ভীর হইলেই অমনি নির্জ্জীব অচেতন প্রাণীর মত হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এই যে চলার আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জড়-ভরতের মত বসিয়া থাকা, ইহাই আমাদের প্রাণশক্তিকে টুঁটি টিপিয়া মারিতেছে। সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউএর কল-গান ও চঞ্চলতা। আমাদিগকে,—বিশেষ করিয়া আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অনেক যুবকের লেখা দেখিয়া মনে হয়, ইহা যেন কোন এক জরাগ্রস্ত বুড়োর লেখা; তাহাতে না আছে প্রাণ, না আছে চিন্তা-শক্তি, না আছে ভাব,—শুধু আবর্জ্জনা, কঙ্কাল আর জড়তা। ইহা বড়ই দুঃখের কথা। সাহিত্যকে এই প্রাণের সোণার-কাঠি দিয়া জাগাইবার যে যাদু-শক্তি, ইহা লাভ করিতে হইলে আমাদের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রথম শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে আপনি একটা বিমল আনন্দ উছলিয়া পড়িতে থাকে। দেখিবেন, যে সাহিত্যিকের স্বাস্থ্য যত ভাল, যিনি যত বেশী প্রফুল্লচিত্ত, তাঁর লেখা তত বেশী স্বাস্থ্য-সম্পন্ন,

তত বেশী কল-মুখর। নবীন সাহিত্যিকগণ সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকিবার জন্য যদি এক আধটু করিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে এই সঙ্গীত, সুরের এই ঝঙ্কার উন্মুক্ত প্রফুল্লচিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নূতন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে। অধিকাংশ "পুঁয়ে মারা" পিলে-রোগাক্রান্ত সাহিত্যিকের লেখাই দেখিবেন অসুস্থ (morbid), ইহাই সহিত্যের স্বচ্ছ-ধারায় আবিলতা আনে। যাঁহার চিত্ত যত নিরাবিল, নির্ম্মল, উন্মুক্ত, হাস্য-মুখর, তাঁহার লেখাও তত নূতন নূতন সম্পদে ভরা (rich)। ইউরোপের লোক যেমন স্বাস্থ্যসম্পন্ন, খেলাধূলা দৌড় ঝাঁপ মারামারি হাসি খুসী যেমন তাহাদের নিত্যকার সঙ্গী, তাহাদের লেখার মধ্যেও ঠিক তাহাদের জীবনের ঐসব গুণ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, উহারই বিপরীত সমস্ত দোষসম্পন্ন বলিয়া আমাদের লেখা, আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি আবার তেমনি সঙ্কীর্ণ, ভণ্ডামি, অসত্য, রোগের বীজাণু প্রভৃতিতে ভরা। লেখকের লেখা হইতেছে তাঁহার প্রাণের সত্য অভিব্যক্তি। যেখানে লেখক সত্য, তাঁহার লেখাতেও সে সত্য সত্যভাবেই ফুটিয়া উঠিবে, যেখানে লেখক মিথ্যা, সেখানে সেই মিথ্যাকে তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও লুকাইতে পারিবেন না। সাধারণের চক্ষে যদি না পড়ে, তবে জহুরীর চক্ষে তাহা পড়িবেই পড়িবে। সাহিত্যে এই প্রাণ, এই উদ্দাম-চঞ্চলতা, এই উদার-মুক্তি আনয়নের চেষ্টা আপাততঃ আমাদের মাত্র দুই একজন তরুণ সাহিত্যিক ভিন্ন অন্য কারুর লেখায় দেখিতে পাইতেছি না। সেই গড্ডলিকা প্রবাহ। সাহিত্যে যে একটা নূতন ধারা চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অনেক নূতন লেখক এখনও অন্ধ। এই সব কারণে

সাহিত্যিকের, কবির লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতউন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্ম্মবিদ্বেষ, জাতি বিদ্বেষ, বড় ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য-সাধনা সাংঘাতিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড় ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার,যত উন্মুক্ত তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন! সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুন না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোন লোক বলিতে পারে ইহা তাহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকেই বলে সাহিত্যে সার্ব্বজনীনতা। এই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আজ রবীন্দ্রনাথ এমন জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পায় না, তাহা স্থায়ী সাহিত্য নয়, খুব জোর দুদিন আদর লাভের পর তাহার মৃত্যু হয়। আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সার্ব্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে,—এই মহাশক্তি

আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জ্জন করিতে হইবে। সত্য যদি লক্ষ্য হয়, সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা ব্রত হয়, তবে তাঁহার লেখা সম্মান লাভ করিবেই করিবে। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মত শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই। এসব কথা আমরা শুধু কোন বিশেষ লেখক সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া বলিতেছি না; ইহা ঔপন্যাসিক, কবি, ছোট গল্প লেখক সকলেরই প্রতি প্রযুজ্য। এই তিন রকমের লেখকের মধ্যে কেহই ছোট নন, কারণ প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য—সৃষ্টি। তিনিই আর্টিষ্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্টএর অর্থ সত্যের প্রকাশ (Execution of truth) এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য, চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ, বা মানুষ এবং প্রকৃতি, (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের নবীন তরুণ আর্টিষ্ট সাহিত্যিক ও কবিগণ এই কয়েকটি কথা মনে রাখিয়া স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টির দিকে চেষ্টা ও প্রাণ প্রয়োগ করিবেন, ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদের এ আশা পূর্ণ হউক!

ছুঁৎমার্গ।

—:•:—

একবার এক ব্যঙ্গ-চিত্রে দেখিয়াছিলাম, ডাক্তার-বাবু রোগীর টিকি মূলে ষ্টেথিস্কোপ বসাইয়া জোর গ্রাম্ভারী চালে রোগ নির্ণয় করিতেছেন! আমাদের রাজনীতির দণ্ডমুণ্ড হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার দলও আমাদের হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিল না হওয়ার কারণ ধরিতে গিয়া ঠিক ঐ ডাক্তার বাবুর মতই ভুল করিতেছেন। আদত স্পন্দন যেখানে, যেখান হইতে প্রাণের গতি-রাগ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে ষ্টেথিস্কোপ না লাগাইয়া টিকি-মূলে যদি ব্যামো নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ, রাজনীতির দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানে প্রাণের মিলনের চেষ্টা করাও তেমনি হাস্যাস্পদ ও ব্যর্থ। সত্যিকার মিলন আর স্বার্থের মিলনে আসমান জমিন তফাৎ। প্রাণে প্রাণে পরিচয় হইয়া যখন দুইটি প্রাণ মানুষের-গড়া সমস্ত বাজে বন্ধনের ভয় ভীতি দূরে সরাইয়া সহজ সঙ্কোচে মিশিতে পারে, তখনই সে মিলন সত্যিকার হয়; আর যে মিলন সত্যিকার, তাহাই চিরস্থায়ী, চিরন্তন। কোন একটা বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য চির-পোষিত মনোমালিন্যটাকে আড়াল করিয়া বাহিরে প্রাণভরা বন্ধুত্বের ভান করিলে সে বন্ধুত্ব স্থায়ী তো হইবেইনা, অপরন্তু সে স্বার্থও সিদ্ধি না হইতে পারে, কেননা মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোন কার্য্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।

এখন কথা হইতেছে যে, আসল রোগ কোথায়? আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে এই ছোঁওয়া-ছুঁয়ির জঘণ্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোন ধর্ম্মেরই অঙ্গ হইতে পারেনা, তাহা কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ অনুদার হইতেই পারে না। ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। এই খানেই বুঝা যায় যে, কোন ধর্ম্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়, তাহা বিশ্বের। আর এই ছুঁৎমার্গ যখন ধর্ম্মের অঙ্গ নয় তখন নিশ্চয়ই ইহা মানুষের সৃষ্টি বা খোদার উপর খোদকারী। মানুষের সৃষ্টি শৃঙ্খলা বা সমাজ-বন্ধন সাময়িক সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো শাশ্বত সত্য হইতে পারে না। এই জন্যই "সম্ভবামি যুগে যুগে" রূপ মহাবাণীর উৎপত্তি। আমাদেরও "হাদিসে" সেইজন্য প্রতি-শত-বর্ষে একজন করিয়া "মুজাদ্দাদ" বা সংস্কারক আসেন বলিয়া লিখিত আছে। "বেদাৎ" বা মানুষের সৃষ্ট রীতিনীতির সংস্কার করাই এই সংস্কারকদের মহান লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গ রূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্ব্বীর্য্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে তাঁহাদের সমস্ত সামাজিক শাসনবিধি একদিনেই উল্টাইয়া ফেলিতে বলিতেছি, তাহা নয়, কিন্তু যে-সত্য হয়ত একদিন সামাজিক শাসনের জন্যই শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তাহার কি আর মুক্তি হইবে না? বাঙ্‌লার মহাপ্রাণ মহাতেজস্বী পুত্র, স্বামী

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতে যেদিন হইতে এই "ম্লেচ্ছ" শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়! মানুষকে এত ঘৃণা করিতে শিখায় যে ধর্ম্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম্ম নয়, ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ্ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্ম্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কি উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কি মহান্ পবিত্র পূজা! আবার সেই ধর্ম্মেরই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় জঘন্য এই ছুঁৎমার্গ বিধি! কি ভীষণ অসামঞ্জস্য! আমাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দহন-পূত কালাপাহাড়ের দলকে সেইজন্য আমরা আজ প্রাণ হইতে আবাহন করিতেছি, এই মান্ধাতার আমলের বিশ্রী বিধি-বন্ধন ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিতে, "আয়রে নবীন, আয়রে আমার কাঁচা!" আমরা যে ধর্ম্মটাকেই একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহিতেছি, ইহা মনে করিলে আমাদের ভুল বুঝা হইবে। আমরা অন্তর হইতেই বলিতেছি যে, আমাদিগকে সীমার মাঝে থাকিয়াই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে; নিজের ধর্ম্মকে মানিয়া লইয়া সকলকে প্রাণ হইতে দু-বাহু বাড়াইয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি সত্যিকার ভাবে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠ, তাঁহার এই উদার বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই আসে। যত ছোঁওয়া-ছুঁয়ির নীচ ব্যবহার ভণ্ড বক-ধার্ম্মিক আর বিড়াল-তপস্বী দলের মধ্যেই। ইহাদের এই মিথ্যা মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া ইহাদের অন্তরের বীভৎস নগ্নতা সমাজের চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে হইবে। এইখানে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। একদিন আমরা, এক ট্রেণে গিয়া উঠিলাম। আমাদের কামরায় মালা-চন্দন-ধারী অনেকগুলি হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন। আমরা কামরায় প্রবেশ করিবামাত্র অর্থাৎ আমাদের মাথায়

টুপী ও পগ্‌গ দেখিয়াই ছোঁওয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা তটস্থ হইয়া অন্য দিকে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই বেঞ্চেরই এক প্রান্তে বসিয়া এক পণ্ডিতজি বেদ বা ঐরূপ কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঐ ভদ্রলোকে-দের শুনাইতেছিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়াই এবং আমাদের অপ্রতিভ ভাব দেখিয়া হাসিয়া আমাদের হাত ধরিয়া সাদরে নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। ভদ্রলোকদের চক্ষু ততক্ষণে কাণ্ড দেখিয়া চড়ক গাছ! আমরাও তখন সহজ হইয়া পাণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি পণ্ডিত ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলতিলক হইয়াও কি করিয়া আমাদিগকে এমন করিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন, অথচ এই ভদ্রলোকগণ আমাদিগকে দেখিয়াই কেন একেবারে দশ হাত লাফাইয়া উঠিলেন? ইহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা, আমি হিন্দু-ধর্ম্মকে ভালোবাসি ও সত্য বলিয়া জানি, বলিয়াই বিশ্বের সকলকে সকল ধর্ম্মকে ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। আমার নিজের ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস আছে বলিয়াই অন্য সকলকে বিশ্বাস করিবার ও প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিবারও শক্তি আমার আছে। যাহারা অন্য ধর্ম্মকে ও অন্য মানুষকে ঘৃণা করে বা নীচ ভাবে, তাহারা নিজেই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেরও কোন ধর্ম্ম নাই। তবে ধর্ম্মের যে ঘটাটা দেখ, তাহা অন্তরের দীনতা হীনতা ঢাকিবারই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র!" ইহা বানানো গল্প নয়, সত্য ঘটনা। মানুষ হইয়া মানুষকে কুকুর-বিড়ালের মত এত ঘৃণা করা —মনুষ্যত্বের ও আত্মার অবমাননা করা নয় কি? আত্মাকে ঘৃণা করা আর পরমাত্মাকে ঘৃণা করা একই কথা। সেদিন নারায়ণের পুজারী বলিয়াছিলেন, "ভাই, তোমার সে পরম দিশারী তো হিন্দুও নয় মুসলমান ও নয়,—সে যে মানুষ!" কি সুন্দর বুকভরা বাণী! এ যে নিখিল-

কণ্ঠের সত্য-বাণীর মূর্ত্ত প্রতিধ্বনি! যাঁহার অন্তর হইতে এই উদ্বোধন-বাণী নির্গত হইয়া বিশ্বের পিষ্ট ঘৃণাহত ব্যথিতদের রক্তে রক্তে পরম শান্তির সুধা-ধারা ছড়াইয়া দেয়, তিনি মহা-ঋষি, তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! যদি সত্যিকার মিলন আনিতে চাও ভাই, তবে ডাক—ডাক, এমনি করিয়া প্রাণের ডাক ডাক। দেখিবে দিকে দিকে অবহেলিত জন-সঙ্ঘ তোমার এই জাগ্রত মহা-আহ্বানে বিপুল সাড়া দিয়া ছুটিয়া আসিবে। যাহারা স্বার্থপর, তাহারা মাথা কুটিয়া মরিলেও তো প্রাণের সাড়া কোথাও পাইবে না, যাহাকে পাইয়া তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিবে তাহা বাহিরের লৌকিক "ডিটো" দিয়া মাত্র। অন্তরের ডাক মহা-ডাক, ডাকিতে হইলে প্রথমে বেদনায়—একেবারে প্রাণের আর্ত্ততারে গিয়া এমনি করিয়া ছোঁওয়া দিতে হইবে। আর তবেই ভারতে আবার নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিবে। হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু এক বার এই মহাগগন-তলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম-বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম্ম!" দেখিবে, দশদিকে সার্ব্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জন-সঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিবে এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা কি বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে! এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে দাঁড় করাইতে পারিলেই ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে, নতুবা নয়। মানবতার এই মহা-যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ—তুমি সত্য। মহাত্মা গান্ধীজি ধরিয়াছেন এই মহা সত্যকে, তাই আজ বিক্ষুব্ধ

জনসঙ্ঘ তাঁহাকে ঘিরিয়া এমন আনন্দের নাচ নাচিতেছে। তোমরা রাজনীতিক যুক্তি-তর্কের চটক দেখাইয়া লেখাপড়া-শেখা ভণ্ডদের মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু অমন ডাকটি আর ডাকিতে পারিবে না। আমরা বলি কি, সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মধ্য হইতে এই ছুঁৎমার্গটাকে দূর . কর দেখি, দেখিবে তোমার সকল সাধনা একদিনে সফলতার পুষ্পে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। হিন্দু মুসলমানকে ছুঁইলে তাঁহাকে স্নান করিতে হইবে, মুসলমান তাঁহার খাবার ছুঁইয়া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়া যাইবে, তাঁহার ঘরের যেখানে মুসলমান গিয়া পা দিবে সেস্থান গোবর দিয়া (!) পবিত্র করিতে হইবে,তিনি যে আসনে বসিয়া হুঁকা খাইতেছেন,মুসলমান সে আসন ছুঁইলে তখনই হুঁকার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,—মনুষ্যত্বের কি বিপুল অবমাননা! হিংসা, দ্বেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক কি সাংঘাতিক বীজ রোপণ করিতেছ তোমরা! অথচ মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতেছ, "ভাই মুসলমান এস, ভাই ভাই এক ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই!" কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়া শুধু হাসি পায়। এসো, যদি পার তোমার স্বধর্ম্মে প্রাণ হইতে নিষ্ঠা রাখিয়া আকাশের মত উদার অসীম প্রাণ লইয়া এসো! এসো তোমার সমস্ত সামাজিক বাধাবিঘ্ন দু'পায় দলিয়া মানুষের মত উচ্চ-শিরে তোমার মুক্ত-বিথার নাঙ্গা মনুষ্যত্ব লইয়া। এসো, মানুষের বিরাট বিপুল বক্ষঃ লইয়া। সে মহা-আহ্বানে দেখিবে আমরা হিন্দুমুসলমান ভুলিয়া যাইব। আমাদের এই তরুণের দল লইয়া আমরা আজ কালাপাহাড়ের দল সৃষ্টি করিব। আমরাই ভারতে আবার অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিব। যে রক্ষণশীল বৃদ্ধ এতটুকু "টুঁ" করিবে, তাহার গর্দ্দান ধরিয়া এই মুক্তির দিনে বাহির

করিয়া দাও। যে আমাদের পথে দাঁড়াইবে, তাহার টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেল। শুধু মানুষ বাঁচিয়া থাক ভাই,—ভারতে শুধু চিরকিশোর মানুষেরই জয় হউক!

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

———০ঃ*ঃ০———

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান!"

—রবিন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবেনা—যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সে হইতেছে, আমাদের দেশের তথা-কথিত "ছোট লোক" সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্ব্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোন যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণীর লোকের অন্তর যদি দেখিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত "ছোট লোক"-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্য-গর্ব্বিত তোমাদের "ভদ্রলোকের" অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই "ছোটলোক" এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেনা, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারা জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজেকে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে

জড়াইয়া যায় যে, সেও যে আমাদেরই মত মানুষ—সেও যে সেই এক আল্লাহএর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে, —তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচারণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে এই হতভাগাদিগকে—আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই ত দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই ত জাতি। আর সে দেশকে, সে জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের এই আভিজাত্য-গর্ব্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা—(যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালবাসা নাই) মনে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে, জাতি-গঠন হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দ্দশা, জাতির দুর্গতি বুঝ, লোককে বুঝাইতে পার এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝ। কাজেই তোমাদের এই দেশকে জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই উপেক্ষিত জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পার, তাহাদিগকেও মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগের শক্তির উন্মেষ করিতে

পার, তাহা হইলে দেখিবে, তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা স্বত্বেও যে কাজ করিতে পারিতেছনা, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়ত তোমার বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু এই সে দিন-কার সত্যাগ্রহ, হরতালের কথা মনে কর দেখি,—একবার মহাত্মা গান্ধির কথা ভাবিয়া দেখ দেখি! তিনি আজ ভারতে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এম্‌নি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইলনা বলিয়া, নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপহাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না তুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটী ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? ইঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই "ছোটলোক"কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,—সে আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,—সে যে ডাকার মত ডাক,—তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্রবাহু মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনও এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করে নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পার, এমনি করিয়া ডাক, এমনি কারয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর—দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া

ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা ত আত্মার ধর্ম্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতই ভাস্বর, আর—একই মহা আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মত ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত বেদনার নির্ম্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি,—ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না? আমরা ভারতবাসীরাই শুধু আত্মার এত অবমাননা করিতে সাহস করি, আর তাই আমাদের এই শোচনীয় অধঃপতন,—তাই বিশ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার আমাদের স্থান নাই। এই আত্মার অপমানে যে সেই অনাদি অনন্ত মহা-আত্মারই অপমান করা হয়। ভয়ে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে না কি? খোদার সৃষ্ট—তাঁহার আনন্দের বিকাশ স্বরূপ এই মানুষকে ঘৃণা করিবার অধিকার তোমায় কে দিয়াছে? তোমাকেই বা বড় হইবার অধিকার কে দিয়াছে, তুমি কিসের জন্ম নিজেকে ভদ্র বলিয়া মনে কর? এ সব যে তোমারই নিজের সৃষ্টি,—খোদার উপর খোদ্‌কারি। এ মহা-অপরাধের মহা শাস্তি হইতে তোমার রক্ষা নাই,—রক্ষা নাই। মানুষের প্রতি এই যে হিংসা দ্বেষ, তোমার দেশের, গাঁয়ের, প্রতিবেশী ভাইদের প্রতি এই যে অকারণ ঘৃণা, আক্রোশ, ইহাই তোমার মুখের বর্ণ কালো করিয়া দিয়াছে—তোমার চেহারায় কালি ছড়াইয়া দিয়াছে। মরিতে ত বসিয়াছ, যদি এখনও এই মৃত হত-ভাগ্যদের হাত ধরিয়া না উঠিয়া একা উঠিতে যাও, তবে আরো মার খাইয়া মরিবে। কিসের পতিত ইহারা? ইহাদের প্রাণ যত উন্মুক্ত—ইহাদের অন্তর যেমন সরল,—তুমি কি সে রকম হইতে পার? হইতে পারে অশিক্ষিত সে, কিন্তু ইহার প্রাণ

তোমার, তোমার চেয়ে অনেক বড়, সে প্রাণে বিরাট বিপুল শক্তি-সিংহ সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে,—যদি পার সেই শক্তিকে জাগাও।

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের এই উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ ভারত-বেদীর সামনে দাঁড়াইয়া বোধন-বাঁশীতে সুর দিই.—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!"

মুখবন্ধ

—::—

খুব সোজা করিয়া বলিতে গেলে নন-কো-অপারেশন হইতেছে বিছুটী বা আলকুসী, এবং আমলাতন্ত্র হইতেছেন ছাগল! ছাগলের গায়ে বিছুটী লাগিলে যেমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে, এই আমলাতন্ত্রও তেমন অসহযোগিতা-বিছুটীর জ্বালায় বে-সামাল হইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিছুতেই যখন জ্বলন ঠাণ্ডা হয় না, তখন ছাগ-বেচারী জলে গিয়া লাফাইয়া পড়ে, দেওয়ালে গা ঘসিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্বালা না কমিয়া আরো বাড়িতেই থাকে, উল্টো ঘসাঘসির চোটে তাহার চামড়াটি দিব্যি ক্ষৌরকর্ম্ম করার মতই লোমশূন্য হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের গায়েও বিছুটী লাগিয়াছে এবং তাই তিনি কখনো জলে নামিতেছেন, কখনো ড্যাঙায় ছুটিতেছেন আর কখনো বা দেওয়ালে গা ঘেঁসড়াইয়া খামখা নিজেরই নুনছাল তুলিতেছেন! তবু কিন্তু জ্বলন আর থামিতেছে না বরং ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। এখন এই আমলাতন্ত্রের ল্যাজের ডগা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই এত অস্বাভাবিক রকমের বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দেখিলে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ইহা যেন বহরমপুর বা কসৌলি প্রেরণের পূর্ব্ব লক্ষণ। একটা

গান আছে, " ও যার কপালে আগুন ধরে, তার নাইক কোথাও সুখ, ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ দুখের উপর দুখ দাও তারে।" বাস্তবিক এখন এই রাজতন্ত্র ওর্ফে আমলাতন্ত্র মশাইএর "অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল!" কেননা অদৃষ্টের ফেরে যাহা কিছু ভাল বুঝিয়া করিতে যাইতেছেন, তাহাই মন্দ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমরা বলি কি, এ সমস্ত নিজেরই কর্ম্মদোষ। কেহ যদি ইচ্ছা করিয়া গা চুল্‌কাইয়া আলকুসী লাগায়, তাহার দায়ী সে নিজে।—দেশের লোক এখন তাহাদের ঘরের অবস্থা সাদাচোখে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইয়াছে। ঘরে যে সিঁদেল চোর ঢুকিয়াছে, এতদিনে তাহারা তাহা টের পাইয়া চোরের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছে। এখন তাহার অপহৃত জিনিস ছাড়িয়া না দিলে সে কিছুতেই আর টুঁটি ছাড়িবে না। চোরে-গৃহস্থে দস্তুরমত এখন এই ধস্তাধস্তি চলিতেছে। তবে চোরের সুবিধাটা এই যে, সে বেশী জোরালো, তার হাতে হাতিয়ারও আছে, আর গৃহস্থ বেচারা একেবারে নিরস্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ তো প্রাণ থাকিতে ঘরের জিনিস পরকে লইয়া যাইতে দিবে না। যাক্ সে সব কথা। আমরা বলিতেছিলাম, এই আমলা বাবাজিরা এমন করিয়া আর কতদিন ছেলে-মানুষী দেখাইবেন? তাঁহারা যে সব বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহার সকলগুলির পরিচয় দিতে হইলে একটী সপ্তকাণ্ড "আমলায়ণ" লিখিতে হয়। তবে সবচেয়ে ঝাঁজালো বুদ্ধিটা দেখাইতেছেন তাঁহারা, যাহার তাহার যে-কোন সময়ে সটান মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া। আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক, এই মুখ বন্ধ করাটা কি যুক্তি সঙ্গত?

ধরুন, দুইজন লোকের মধ্যে তর্ক হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে একজন বেশী বলবান কিন্তু দুর্ব্বল বেচারার গায়ে জোর না থাকিলেও

সে মনের জোর লইয়া, সত্যের জোর লইয়া বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্রমেই ঘায়েল করিয়া ফেলিতেছে ; ঠিক এই সময়েই অনন্যোপায় হইয়া বলবান রাগিয়া বলিয়া উঠে, "চুপ রও!" অর্থাৎ কিনা তোমায় মুখবন্ধ, তুমি কোন কথাই বলিতে পাইবে না! যাহার মনের জোর নাই—সত্যের জোর নাই, সে-ই এমন করিয়া গায়ের জোরে দুর্ব্বলকে থামাইতে চেষ্টা পায়। যদি তাহার যুক্তিযুক্তরূপে বুঝাইবার বা মনে সত্য-দাবীর জোর থাকিত, তাহা হইলে গায়ের জোর দিয়া বুঝাইবার দরকার হইত না। যাহাদের মনে পাপ, তাহারা বাহিরে যতই গদাইলশ্‌করি চাল দেখাক, অন্তরে তাহারা খ্যাঁকশিয়ালীর চেয়েও ভীরু। যাই তাহারা দেখে যে, অন্য কেউ তাহাদের আঁতে ঘা দিতেছে বা মনের পাপটাকে বাহিরে দিনের আলোতে খুলিয়া দেখিতেছে, অমনি তাহারা "ঐ রে চিচিং ফাঁক হ'ল" বলিয়া চেঁচাইয়া চিল্লাইয়া হুমকী দেখাইয়া তাহাদের মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা পায়। কিছুতেই না পারিলে তখন আইনের শীল-মোহর! আজ-কাল ছোট দারোগা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই এই উপায়টাকেই "বিপদভঞ্জন মধুসূদন" রূপে জাপটীয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু এখন তাঁহারা ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন! কেননা ইহাতে উক্ত শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া ক্রমেই ভ্রুকুটী-কুটিল হইয়া পড়িতেছেন! কি গেরো! "সখিহে, কি মোর করমে লিখি?" মনে করিয়াছিলেন, এ জলে আগুন না নিভিয়া যায় না কিন্তু তাহা না হইয়া আগুন ক্রমেই শিখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। ইঁহারা এই সোজা কথাটা বুঝিতেছেন না যে, জোর করিয়া একজনকে চুপ করাইয়া দিলে তাহার ঐ না কওয়াটাই বেশী কথা কয়। কারণ, তখন তাহার একার মুখ বন্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহার হইয়া—সত্যকে, ন্যায়কে রক্ষা

করিবার জন্য—আরো লক্ষ লোকের জবান খুলিয়া যায়। বালির বাঁধ দিয়া কি দামোদরের স্রোত আটকানো যায়?

সেদিন চিত্তরঞ্জনকে বলিলে, "এখানে আমার এলাকায় টুঁ টি করিতে পারিবে না, এমন কি এখানে 'হাঁদাইতেই' পারিবে না!" কিন্তু যেই দেখিলে অবস্থা বড় বে-গতিক অম্‌নি সে হুকুম বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া ফেলিলে। আবার মিঃ আলী শেরওয়ানীকে আগ্রায় বক্তৃতা দিতে মানা করিয়াছ। এমন করিয়া ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন করিয়া যেখানে সেখানে হাব্‌সাইলে কি হইবে? উল্টো জনসংঘ আরো ক্ষেপিয়া পাগল হইয়া উঠিবে। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, সুশীল সুবোধ বালক হও, সাধারণকে সে কথা বুঝাইয়া দাও। তাহা না হইলে অন্যায়কে ঢাকা দিয়া রাখিতে পারিবে না—পারিবে না।

জোর জবরদস্তি করিয়া কি কখনও সচেতন জাগ্রত জন-সঙ্ঘকে চুপ করানো যায়? যতদিন ঘুমাইয়াছিলাম বা কিছু বুঝি নাই, ততদিন যাহা করিয়াছ সাজিয়াছে; এতদিন মোয়া দেখাইয়া ছেলে ভুলাইয়াছ এখনও কি আর ও-রকম ছেলে-মানুষী চলিবে মনে কর? আমাদের বড় ভয় হয়, এ মুখ-বন্ধ আমাদের নয়, তোমাদের। আশা করি আমাদের এ ভয় মিথ্যা হইবে না!

রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন

একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদের পৃথিবীর ধ্বংস (প্রলয় বা রোজ কিয়ামত) হবার দিন যত দূর মনে করি, বাস্তবিক ততদূর নয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সব আলোচনা হইয়াছে, সেই সব লইয়াই আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ইহা লক্ষ্য হইতেছে যে, দক্ষিণ পোলার প্রদেশে ভাসমান তুষারের স্তূপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। এডমণ্টের ক্যাপ্টেন স্মিথার্থ সর্ব্ব প্রথম ৫৮০ ফুট উচ্চ এক তুষার স্তূপ দেখিতে পান! অতঃপর স্কট সাহেব ৬০০ ফুটেরও উচুঁ এক বরফের পাহাড় দেখিতে পান। কিন্তু এজনেটার একজন নাবিক সমুদ্রের উপরেও হাজার ফুটের বেশী উচ্চ এক পর্ব্বত প্রমাণ বরফ স্তপ আবিষ্কার করেন এবং তাহাতে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়া যায়। পরে নির্দ্ধারিত হয় যে এই তুষার পর্ব্বত ৯৬১২ ফুট পুরু অর্থাৎ পৌনে দুই মাইলেরও বেশী চওড়া!

দক্ষিণ বিষুব রেখায় অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-পর্ব্বত সমূহের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আর এই জন্যই দক্ষিণ-পোলার প্রদেশ সমূহ ভয়ানক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। উত্তর দিকস্থ বহুদূরের ভাসমান তুষারস্তূপসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ-

আমেরিকায় অত্যধিক শীতের সৃষ্টি করিয়াছে। এখানের শৈত্যের সঙ্গে অন্যস্থানের তুলনাই হয় না। "বুইনস্ এরিণ" নামক স্থানে সম্প্রতি এক তুষার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এই দেশে আর কখনও তুষার-বৃষ্টি হয় নাই।

এ সবের মানে কি? প্রফেসর লুইস ও অন্যান্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক-গণের মতে আমাদের পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাপ্লাবন বা মহাধ্বংস অতি আসন্ন। যদি সমস্ত দুনিয়াও ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর একাংশ যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাস্তি।

দক্ষিণ মেরুতে যে গগন-চুম্বী বরফের মহা আচ্ছাদন রহিয়াছে, তাহা লম্বাতে চৌদ্দশত মাইল এবং কত শত মাইল যে পুরু তাহার ইয়ত্তাই নাই! এখন এই যে দক্ষিণ মেরুর আবহাওয়া এই রকমে ক্রমেই অসহ্য উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহার পরিণাম কি? সকলেই জানেন বরফ গরম হইলেই গলিয়া যায়। সুতরাং এখন দক্ষিণ মেরুর এই অত্যধিক উষ্ণতার দরুণ সেখানের ঐ সহস্র সহস্র যোজন ব্যাপী তুষারের মহা-পর্ব্বত সমূহ ভাঙ্গিয়া গলিয়া যাইবে, এবং আকাশ-সমান—সচল হিমালয়ের মত তরঙ্গের রাশি চতুর্দ্দিক ধুইয়া মুছিয়া লইয়া যাইবে! প্রথমে এই মহা-প্লাবনে আক্রান্ত হইবে পৃথিবীর ঢালু দিক অর্থাৎ দক্ষিণ মহাদেশ সমূহ।

পুরাকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধূমকেতুকে ভয়ানক ভয় করিতেন, কেননা তাঁহারা জানিতেন না যে, ধূমকেতু কি। আমাদের পরবর্ত্তী পিতাগণ এ সম্বন্ধে বেশী জানিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও ধূমকেতুকে অত্যন্ত ভয় করিতেন ও অলক্ষুণে মনে করিতেন। কারণ, তাঁহারা মনে করিতেন এই সব ধূমকেতুর মস্তক নীরেট, সুতরাং পৃথিবীর এত

নিকটে আসার দরুণ যদি তাহার সহিত দৈবক্রমে পৃথিবীর সংঘর্ষ হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধূমকেতু নীরেট শক্ত নয়, উহা কুয়াশার মত নীহারময়। সুতরাং যদি দৈবক্রমে এক আধটা ধূমকেতুর পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষও হইয়া যাইত, তাহা হইলে ইহা দ্বারা পৃথিবীর কোন অংশ গভীর গর্ত্তও হইয়া যাইত না বা ইহা আমাদিগকে পৃথিবীর আকর্ষণের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিতেও সক্ষম হইত না।

কিন্তু ফ্রান্সের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মঁসয়ে ক্যামিল্লি ফ্লামারিয়ন সাহেব এক বিশ্ব-ত্রাস বিভীষিকাময় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহা এই যে ধূমকেতুর ঐ যে নীহারময় পুচ্ছ তাহা মহা বিষাক্ত গ্যাসে ভরপুর। সেইজন্য ধূমকেতু যদি একবার পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিতে পারে, তাহা হইলে ঐ বিষাক্ত গ্যাসে সমস্ত পৃথিবী এক নিমেষে প্রাণীশূন্য হইয়া যাইবে, তাহার রূপ রস গন্ধ চিরদিনের তরে ধুইয়া মুছিয়া সাফ হইয়া যাইবে!

ধূমকেতুর সৃষ্টির রাসায়নিক ব্যাখ্যা এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নাই, কিন্তু ইহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন যে, ধূমকেতু ইহার পুচ্ছে নিশ্চয়ই গ্যাস ভরিয়া রাখে। এই গ্যাস অনায়াসে আমাদের পৃথিবীর বাতাস হইতে যবক্ষারজান শুষিয়া লইতে পারে এবং তাহা হইলে যেদিকে যাও সেই দিকেই মরণ আর কি! সাধে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই জিনিষটাকে এত অপসন্দ করিতেন! কথায় বলে, "ধূমকেতুর মত সে এসে আমার অদৃষ্টে উদয় হ'ল!" পৃথিবীর অদৃষ্টেও ধূমকেতু বাস্তবিকই অলক্ষুণে' বা অমঙ্গলজনক।

যাক্, যদি ইহা যবক্ষারজান বাতাস হইতে শুষিয়া লয় তাহা হইলে

আমরা শুধু অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্পই পাইব। সত্য বটে যে, অম্লজান বাষ্প রক্ত সঞ্চালন এবং মানসিক ও শারীরিক কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাই বলিয়া শুধু অম্লজান বাষ্প আবার ভয়ানক মারাত্মক। সুতরাং নিশ্বাস প্রশ্বাসে শুধু উত্তেজক অম্লজান বাষ্প পাইয়া আমাদের শরীর ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে এবং ক্রমে আমরা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইব।

কয়লা-যুগের সময় এই পৃথিবীর বাতাস কার্ব্বনিক এসিডের দরুণ ভারী ছিল। সে সময় সে বাতাস মানুষে সহ্য করিতে পারিতনা। কেবল মৎস্য ও সরীসৃপ জাতীয় জীববৃন্দ স্রোতময় জলাভূমিতে ও নিশ্চল বাতাসে বাঁচিয়া ছিল। ক্রমশঃ উদ্ভিদ ও গাছ-গাছড়ার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষাক্ত নিশ্চল বাতাস দূর হইয়া যাইতে লাগিল, আকাশ পরিষ্কার হইল এবং এইরূপে এই বাতাস উষ্ণ রক্তময় জীবের উপযোগী হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমানে মানব জাতি কয়লা খনন কার্য্যে ও তাহার সাহায্য গ্রহণে বিষম ব্যস্ত। এই কয়লা কখনকার জানেন কি? ইহা ঐ বহুলক্ষ যুগ পূর্ব্বের কার্ব্বনিক এসিড-ভরা বাতাসের কালের এবং এই কয়লা সেই সময়কার গাছ-গাছাড়ারই পরিণতি হইতে পারে, কেননা বনের গাছ-গাছাড়া এখনো ঐ কার্ব্বনিক এসিড শোষণ করিতে ওস্তাদ।

প্রত্যেক কয়লার চাপ ও প্রত্যেকটি দেশালাই যাহা জ্বালানো হয়, তাহা প্রত্যহ আমাদের দরকারী অম্লজান বাষ্প নিঃশেষ করিতেছে।

একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, জগতের অম্লজান বায়ু ক্রমশঃই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, এবং বাতাসও সেই জন্য ক্রমেই কলুষিত হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সেদিন

আগতপ্রায়—যেদিন পৃথিবীর সমস্ত-কিছু কার্ব্বনিক এসিডময় যুগের জীবে পরিণত হইয়া যাইবে।

মানুষ ক্রমেই ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইতে হইতে শেষে লিলিপুটিয়ানদের মত হইয়া পড়িবে, তারপর একেবারেই নেস্ত-নাবুদ! তারপর আদির মতই অন্ত! অর্থাৎ প্রথমে যেমন মৎস্য আর সরীসৃপ জাতিই ছিল, পরেও তেম্‌নি য়্যা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহা-মৎস্য আর মহা-সরীসৃপ অবতারগণ বহাল খোশ তবিয়তে বিরাজ করিবেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খুব সরু লম্বা লম্বা ঘৃণ্য সরীসৃপ জাতিও—যেমন কি কেঁচো সাপ ইত্যাদি—প্রচুর পরিমাণে আবার আমাদের চিপেয় রাজত্ব করিবে।

যদি মানবজাতি বর্ত্তমানের এই অনিষ্টকারী কয়লার মহা খরচা ছাড়িয়া দেয় (শুধু কয়লা জ্বালানোর জন্যই বৎসরে ১৬০০ মিলিয়ন টন অম্লজান বাষ্প নষ্ট হইতেছে!) এবং তৎপরিবর্ত্তে ইলেক্‌ট্রিক দিয়া কয়লার কাজ চালাইয়া লয়, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার আর এক নূতন বিপদের মুখ-গহ্বরে পড়িতে হইবে। অর্থাৎ যেদিকেই যাও, নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। জলে কুমির, ড্যাঙায় বাঘ!

আগে হইতেই আবহাওয়ার ক্রম-পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইতেছে। বজ্রাঘাত—বিশেষ করিয়া শীতকালে বজ্রপতন—ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আর, ইহার একদম সোজা কারণ রহিয়াছে যে, পৃথিবীর আর বাতাসের ইলেক্‌ট্রিসিটি ঠুঁকাঠুঁকির দরুণই এই বজ্র উৎপাতের সৃষ্টি! তাহা হইলে কঃ পন্থা? সেই জন্যই বুঝি পান্নাময়ী আগে হইতেই গাহিয়া রাখিয়াছে, "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয়ই মরিব!!"

আচ্ছা ধরুন, যদি বায়বীয় ইলেক্‌ট্রিসিটির উপরে বর্ত্তমান অপেক্ষা

শত বা সহস্রগুণ ভার চাপানো হয়, তাহা হইলে আর কি বসন্তে ফুল ফুটিবে—কচি পাতা গজাইবে? আর কি তবে বর্ষার ব্যাকুল বরিষণ পৃথিবীর বক্ষ সিক্ত করিবে? না গো না! তার বদলে বজ্র-পতনই হইবে আমাদের পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। রোজ শত শত বজ্রপাতে পৃথিবী ছিন্না ভিন্না হইয়া যাইবে। একজন ধুরন্ধর উল্কাতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হাঁ হাঁ তাহাই হইবে অবশেষে! কি ভয়ানক! আমাদের এখন উচিত যে আমরা সবাই মিলিয়া প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া বিশ্বাস করি, ও-ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা এবং তিনি ভুল বুঝিয়াছেন! ঐ যে আমাদের আলোকদাতা সবিতা স্থয্যি মামা,—উনি শুধু যে আলো আর উষ্ণতারই সৃষ্টি করেন তা নয়, তিনি ইলেক্‌ট্রিক শক্তিরও জনক। আর এই আমাদের একমাত্র মামা যিনি প্রকৃতির এই প্রহেলিকাময় অজানা শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সব দিক সমঝাইয়া চলিবেন! মামা জীবতু!

বর্ত্তমান স্থয্যিমামার ক্ষমতা এত উগ্র প্রচণ্ড যে, যদি এঁর সমস্ত রশ্মি আর উগ্রতা শুধু আমাদের এই গরীব পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়িত, তাহা হইলে মাত্র দেড় মিনিটের মধ্যেই ঐ যে আগে মহামহা বরফ-পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, সেই সমস্তই গলিয়া টগবগ করিয়া ফুটিত। এবং আর এগারো সেকেণ্ড থাকিলে দুনিয়ার যে এত বড় বড় সমুদ্র, সমস্ত শুকাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া হাঁ করিয়া থাকিত।

কিন্তু স্থয্যি মামাও দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া ছোট হইয়া চলিয়াছেন। দৈনিক কতটুকু করিয়া যে তাঁহার বর-বপুর সঙ্কোচন হইতেছে তাহা এখনো জানা যায় নাই। প্রফেসর বার্ণস্ জোরের সঙ্গে বলেন যে, স্থয্যি মামার এই সঙ্কোচন বড় জোরেই চলিতেছে। এত জোরে যে আমরা

তাহার একটা মোটামুটি ধারণাও করিতে পারি না। অতি অল্পকালের মধ্যেই সূর্য্যের উত্তাপের কম্‌তি দেখিয়া বুঝিতে পারিব যে সত্যি সত্যিই সূর্য্য ছোট হইয়া যাইতেছে কি না।

এইরকম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে হইতে যখন সূয্যি-মামা পটল তুলিবেন অর্থাৎ তাঁহার আর অস্তিত্বই থাকিবে না, তখন যে দুর্দ্দশা হইবে পৃথিবীর, তাহার চিন্তাও মহা-ভয়াবহ! যত জল জমিয়া একেবারে পাথরের চেয়েও শক্ত হইয়া উঠিবে, কিন্তু দেখিতে হইবে খাসা—একেবারে হীরের টুক্‌রোর মতন জ্বল্‌জ্বলে'! এই যে বাতাস যাহাকে এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহা তখন বৃষ্টির মোটামোটা ফোঁটার মত হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। এইসব আবার গহ্বরে গহ্বরে জমিয়া কাচের চেয়েও স্বচ্ছ সরোবরে পরিণত হইবে, কিন্তু তাহাতে ঢেউ খেলিবে না, শুধু নির্ব্বিকার, প্রশান্ত! কেননা তখন বাতাসই যে বহিবে না। সমস্ত পৃথিবী তখন নির্দ্দয় শীতের প্রকোপে জমিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া যাইবে। শুধু নীহারিকা আর অস্পষ্ট কুয়াসা!

সূর্য্য আস্তে আস্তে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, আবার সারাদিন অম্‌নি রক্তবর্ণ থাকিবে। ঠিক যেন আধ-নির্ব্বাপিত একটা জ্বলন্ত গলিত লৌহ-পিণ্ড! দিনেই তখন সমস্ত আকাশ আরো উজ্জ্বল তারায় ভরিয়া উঠিবে! আল্লা-হু-আক্‌বর!

বাঙালীর ব্যবসাদারী

—:•:—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" কথাটা যেমন দিনের মত সত্য, "বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা" কথাটা তেম্‌নি রাতের মতই অন্ধকার। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি না করিতে পারিলে জাতির পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, সত্যের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে বাণিজ্যের পতনও আবার তেমনি অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ বলিয়া খাওয়ানো তত দোষের নয়, যত দোষ হয় মদকে দুধ বলিয়া খাওয়ানোতে। দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া বিক্রি করিলে লাভ হয় যত, প্রবঞ্চনা করার পাপটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। একটা জাতি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা যত বড় হয় হউক, কিন্তু প্রবঞ্চনা বা মিথ্যার বিনিময়ে যেন তাহার জাতীয় বিশ্বস্ততা আর সুনাম বিক্রি করিয়া সে ছোট না হইয়া বসে। ভণ্ড লক্ষপতি অপেক্ষা দরিদ্র তপস্বী ঢের ভালো। হাঁ, এখন কথা হইতেছে—বাণিজ্য দ্বারা আমরা স্বজাতির নাম করিব, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, না—অন্য বড় জাতির নাম দিয়া নিজের নাম ভাঁড়াইয়া বড় হইয়া সেই বড় জাতিরই তেলা-মাথায় তেল ঢালিব? কথাটা একটু খোলাসা করিয়া বলি।

আমাদের বাঙালীদের হিন্দু মুসলমান অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে বেশ একটু ঝোঁক দিয়াছেন, সে খুব মঙ্গলের কথা। তবে ইহার

মধ্যে অমঙ্গলের কথা হইতেছে এই যে, ইঁহাদের অনেকেই নিজের বা স্ব-জাতির নাম ভাঁড়াইয়া ইংরাজী নামে নিজের নূতন নামকরণ করিতেছেন! কি সুন্দর মৌলিকতা! যিনি অতটা না করেন, তিনি আবার নিজের পৈতৃক নামটাকে বিপুল গবেষণার সহিত বহু কসরৎ করিবার পর এমন একটী অস্বাভাবিক অশ্ব ডিম্বে পরিণত করিয়া বসেন, যাহা আমাদের পূর্ব্ব বা পরপুরুষের কোন ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন না, ইনি কিনি! এইরূপে কৃষ্ণকে ক্রিষ্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশী। শুনিয়াছি, এই রকম কালা চামড়ায় সাদা পালিশ বুলাইলে নাকি দুই একজন শ্বেতদ্বীপবাসী বা বাসিনী ভুলক্রমে ঐ দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা আসল ব্যাপার বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তেই সওদা করিয়া চলিয়া যান; কিন্তু এই প্রতারণা ধরা পড়িলে যে আবার অনেকে মুখের উপরেই দোকানদারকে প্রবঞ্চক ভণ্ড বলিয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন এটাও সত্য! অনেকে ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে কিছু না বলিলেও মনে মনে দেশীয় দোকান-দারের এই ক্ষুদ্রত্বের নিন্দা না করিয়া পারেন না। আর, নাম ভাঁড়াইয়া কোন কাজ করিবার পর আসল নামটা প্রকাশ হইয়া গেলে কেহ যদি মুখের উপরেও গালাগালি করে, তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে হজম করা ভিন্ন কোন উপায় থাকে না। কিন্তু, দ্বারে আসল নামটা লেখা থাকিলে অন্তরের বাহিরের এ সব কোন বিড়ম্বনাই আর সহ্য করিতে হয় না। তা ছাড়া, এই রকম কালার গায়ে সাদার দাগ লাগাইয়া লাভও যে খুব বেশী হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ ইহাতে এইরকম দোকানদারগণ যেমন দু-একটী বিদেশী খরিদ্দার পান,

তেম্‌নি আবার অনেকগুলি স্বদেশী খরিদ্দারও হারান। কেননা আমাদের দেশের শহরের সোজা বা পাড়াগাঁয়ের ভদ্র মাঝারি লোকে সহজে সাহেবের দোকান মাড়াইতে চান না। ইঁহাদের কেহ বা ও-সব বিজাতীয় হেঙ্গামের মধ্যে যাইতে চান না, কেহবা স্বদেশী দোকানেই জিনিস কিনিতে ভালোবাসেন, আবার কেহ বা নানান দিক দিয়া নিজের দীনতা ধরা পড়িবার ভয়েই ওসব দোকানে যান না। আমাদের অনেক দেশীয়-লোকের আবার একটা ধারণা এই যে, সাহেবের দোকানের জিনিষের দাম দেশীয় দোকানের চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই বেশী দামে দুই চারিটা জিনিস সাহেবদের বিক্রী করিতে পারিলেও অন্য দিক দিয়া এ সব দোকানের অনেক ক্ষতি। সাহেব খরিদ্দারগণ বেশী দামে দামী জিনিষ কিনিলেও তাঁহারা সংখ্যায় কম। সে অনুপাতে কম-দামী জিনিসের ক্রেতা বহু দেশীয় লোকের অপেক্ষা বেশী টাকার জিনিসও দোকানে বিক্রি হয় না। অথচ, যদি দেশীয় দোকানদার, বাণিজ্যে পসার করিয়া একবার সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে বহু বিদেশী বা সাহেব-খরিদ্দার আপনিই জুটিয়া যাইবে। এই ধরুন, আমাদের বটকৃষ্ণ পালের কথা। ইনি অনায়াসেই নিজের পৈতৃক নাম কাটছাঁট করিয়া অন্ততঃ "মণ্টোক্রিষ্টো পল" হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে যদিই বা পসার হইত কিন্তু সকলের নিকট এত নাম হইত না, এবং আমরাও গর্ব্বের সহিত এমন একজন বাঙালী ব্যবসায়াভিজ্ঞ লোকের নাম যেখানে সেখানে উদাহরণ স্বরূপ পেশ করিতেও পারিতাম না। বে-নামীতে যে দু-একজন বাঙালী ব্যবসাদার বেশ একটু পসার করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা বাঙালী বলিতে সঙ্কোচ করি, লজ্জা হয়। কেননা তাঁহারা নিজেই সর্ব্বপ্রথমে

নিজের বাঙালীত্ব অস্বীকার করিয়াছেন! কাজেই ইঁহারা হইয়া পড়িয়াছেন বাদুড়ের মতন—না পাখী, না পশু!

তাহা ছাড়া, ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা নয় কি? ইহাতে নিজেকে, দেশকে, জাতিকে ছোট করিয়া দেখা হয় না কি? নিজের কৃতিত্বে দেশের লোকের সুনামে, জাতির আত্ম-বিশ্বাসে আমাদের নিজের লোকেরাই কত বেশী হেয় ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন, আমরা কি জগতের এতই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীব যে, আমাদিগকে আমাদের নিজ সত্যিকার পরিচয় লুকাইতে হইবে? আমরা কি এতই অমানুষ, এবং যাহাদের নামের দৌলতে এই জঘন্য অর্থ-লাভ তাহারাই কি এত মস্ত মানুষ? দেখিয়াছি, অনেকে তথা-কথিত নীচ বংশে জন্ম বলিয়া নিজের পিতৃপুরুষের পরিচয় গোপন করে, কিন্তু তবু সে শান্তি পায় কি? লোকে তাহার এই মিথ্যা মুখোসে বরং আরো টিট্‌কারী দেয় না কি? সে নিজের অন্তরেই নিজে লজ্জাতুর ছোট হইয়া যায় না কি? তাহার চেয়ে তাহার গৌরব করিবার ছিল, যদি সে বুক ফুলাইয়া তাহার পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়া নিজের কৃতিত্বে আপন মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারিত যে, জন্মটা কিছুই নয়—পুরুষকারই হইতেছে আসল জিনিস। তাহাতে তাহার নিজের অন্তরেও সে বল পাইত আনন্দ পাইত এবং অন্যেও তাহার নির্ভিকতার, মনুষ্যত্বের কাছে সসম্মানে মাথা নত করিত। আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজো যদি আমাদের আত্ম-সম্মান না জাগে—আজো যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ও পুরুষকারের জোরে মাথা উঁচু করিয়া বিশ্বের মুক্ত-পথে চলিতে না পারি, তবে আমাদের জাতি-গঠন তো দূরের কথা,

মুক্তদেশের অন্যে এ কথা শুনিলে মাথায় টোক্কর লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু-করে' চল্‌তে শেখো!

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এখন অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু যাঁহাদের সাহস আছে, আত্মসম্মান আছে, জাতিকে যিনি বড় করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার উচিত এখ্‌খুনই এ মিথ্যা মুখোসটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া নিজের বিশ্বাসে নিজের কৃতিত্ব কর্ম্মকুশলতা ও পৌরুষতার পুঁজি লইয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে দাঁড়ানো। তাহাতে তাঁহার নাম, তাঁহার দেশের নাম, তাঁহার জাতির নাম। আর সব চেয়ে বড় জিনিস, তাঁর নিজের অন্তরের শান্ত পূত মহাতৃপ্তির, অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদের বিপুল গৌরব।

এই জাতিয়তার যুগে, এই নিজেকে সত্য বলিয়া জানার সাহসী কালেও ঐ পুরানো বিশ্রী অভিনয়ের হেয় অনুকরণ হইতেছে বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। ডোম যদি নিজেকে ডোম বলিয়া সসঙ্কোচে পথ ছাড়িয়া দিয়া আমাকে দীর্ঘ গোলামী সালাম ঠুঁকে, তাহা হইলে স্বতই তাহার প্রতি আমার একটা উঁচু নীচুর ভাব আসে, কিন্তু সে যদি ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজ হইয়া আমার পথে মানুষের মত দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরে আমি অভ্যাস বশতঃ যতই ক্ষুব্ধ হই, অন্তরে তার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব জ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু নীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি—তাঁহাকে নমস্কার করি!

হাঁ,—ব্যক্তিত্বের দিক ব্যতীত দেশীয় লিমিটেড কোম্পানীগণও তাঁহাদের ম্যানেজিং এজেন্টের কল্পিত ইংরেজী নাম রাখিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিতেছেন। কি বিশ্রী প্রতারণা! কি ঘৃণ্য অধঃপতন!

আজ আমরা তাঁহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাঁহারই পায়ের ধুলা মাথায় লইব,—তিনি মুচি, মেথর, ডোম, হাড়ি যেই হউন,—যিনি মহাবীর কর্ণের মত উচ্চশিরে সর্ব্বসমক্ষে মঞ্চে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, "আমি সূতপুত্রই হই আর যেই হই, আমার পুরুষকারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ!"

আমাদের শক্তি স্থায়ী হয়না কেন?

—— o:※:o ——

এ প্রশ্নের সর্ব্বপ্রথম উত্তর, আমরা চাকুরি-জীবি। মানুষ প্রথম জন্মে তাহার প্রকৃতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিত্র সরলতা লইয়া। সে চঞ্চলতা চির-মুক্ত, সে স্বাধীনতা অবাধ-গতি, সে সরলতা উন্মুক্ত উদার। মানুষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ডী, সমাজের সঙ্কীর্ণতা, জাতির দেশের ভ্রান্ত গোঁড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার জন্মগত মুক্ত প্রবাহের ধারা সে হারাইতে থাকে, ততই তাহার স্বচ্ছপ্রাণ এইসব বেড়ীর বাঁধনে পড়িয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিতে থাকে। এ সব অত্যাচার সহিয়াও অন্তরের দীপ্ত স্বাধীনতা ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু পরাধীনতার মত জীবন-হনন-কারী তীব্র হলাহল আর নাই। অধীনতা মানুষের জীবনী-শক্তিকে কাঁচাবাঁশে ঘুণ ধরার মত ভূয়া করিয়া দেয়। ইহার আবার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, ইহা আমাদিগকে একদমে হত্যা করিয়া ফেলেনা, তিল তিল করিয়া আমাদের জীবনী-শক্তি, রক্ত-মাংস-মজ্জা, মনুষ্যত্ব, বিবেক সমস্ত কিছু জোঁকের মত শোষণ করিতে থাকে। আখের কল আখকে নিঙড়াইয়া পিশিয়া যেমন শুধু তাহার শুষ্ক ছ্যাবা বাহির করিয়া দিতে থাকে, এ অধীনতা মানুষকে—তেমনি করিয়া

পিশিয়া তাহার সমস্ত মনুষ্যত্ব নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া, তাহাকে ঐ আখের ছ্যাবা হইতেও ভুয়া করিয়া ফেলে। তখন তাহাকে হাজার চেষ্টা করিয়াও ভালমন্দ বুঝাইতে পারা যায় না। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমাদিগকে কোন স্বাধীন-চিত্ত লোক এই কথা বুঝাইয়া বলিতে আসিলেই তাই আমরা সাফ্‌ বলিয়া দিই, "এ লোকটার মাথা গরম!"

সারা বিশ্বে বাঙ্গালীর এই যে সকল দিকেই সুনাম, কিন্তু তবুও আমরা কেন এমন দিন-দিন মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইয়া পড়িতেছি? কেন ভণ্ডামী, অসত্য, ভীরুতা, আমাদের পেশা হইয়া পড়িয়াছে? কেন আমরা কাপুরুষের মত এমন দাঁড়াইয়া মার খাই? ইহার মূলে ঐ এক কথা আমরা অধীন—আমরা চাকুরীজীবি। দেখাইতে পার কি, কোন জাতি চাকুরি করিয়া বড় হইয়াছে? আমরা দশ পনর টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে। যে দশ টাকা পায়, সে যদি পাড়াগাঁয়ে গিয়া অন্ততঃ মুদি ফেরিওয়ালারও ব্যবসা করে, তাহা হইলেও সে বিশ পঁচিশ টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়, আদতে আমরা ইচ্ছাই করিবনা, চেষ্টাই করিবনা, হইবে কোথা হইতে? যে জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি শিল্প যত বেশী, সে জাতির মধ্যে স্বাধীন চিত্ত লোকের সংখ্যা তত বেশী, আর কাজেই যে জাতির জনসঙ্ঘের অধিকাংশেরই চিত্ত স্বাধীন, সে জাতি বড় না হইয়া পারে না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি।

আমরা আজ অনেকটা জাগ্রত হইয়াছি, আমরা মনুষ্যত্বকে এক-আধটুকু বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদের এ মনুষ্যত্ব-বোধ এ শক্তি স্থায়ী হইতেছে না, শুধু ঐ চাকুরী-প্রিয়তার জন্য। সোডা-ওয়াটারের মত আমাদের শক্তি, আমাদের সাধনা, আমাদের অনুপ্রাণতা এক নিমিষে উঠিয়াই থামিয়া যায়, শোলার আগুনের মত জ্বলিয়াই নিবিয়া ছাই হইয়া যায়। আমরা যদি বিশ্বে মানুষ বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাই, তবে আমাদের এ-শক্তিকে এ-সাধনাকে স্থায়ী করিতে হইবে, নতুবা যে "তিমিরে সে-তিমিরে।" এবং তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে চাকুরী ছাড়িয়া, পর-পদলেহন ত্যাগ করিয়া স্বাধীনচিত্ত উন্নত-শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেখিয়াছ কি, চাকুরী-জীবিকে কখনও স্বাধীনচিত্ত সাহসী ব্যক্তির মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে? তাহার অন্তরের শক্তিকে যেন নির্ম্মম ভাবে কচ্‌লাইয়া দিয়াছে, ঐ চাকুরী; অধীনতা; দাসত্ব। আসল কথা, যতক্ষণ না আমরা বাহিরে স্বাধীন হইব ততক্ষণ অন্তরের স্বাধীন-শক্তি আসিতেই পারে না।

কালা আদমিকে গুলি মারা

একটা কুকুরকে গুলি মারিবার সময়ও এক আধটু ভয় হয়, যদিই কুকুরটা আসিয়া কোন গতিকে গাঁক্ করিয়া কামড়াইয়া দেয়! কিন্তু আমাদের এই কালা আদমীকে গুলি করিবার সময় সাদা বাবাজিদের সে ভয় আদৌ পাইতে হয় না। কেননা তাহারা জানে যে, আমরা পশুর চেয়েও অধম। একবার এক সাহেবের গুলির চোটে আমাদের স্বগোত্র এক কালা আদমী মারা যায়, তাহাতে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন "কৌন্ মারা গিয়া?" একজন আসিয়া বলিল "এক দেহাতি আদমী হুজুর!" সাহেব দিব্যি পা ফাঁক করিয়া স্বস্থির নিশ্বাস ফেলাইয়া বলিল, "ওঃ হাম সম্‌ঝা ঠা, কোই আড্‌মি!" অর্থাৎ ঐ গ্রাম্য বেচারা সাহেবের বিড়াল-চোখে মানুষই নয়। মনুষ্যকে এত বড় ঘৃণা আর কেহ কোথাও পারে কিনা, জানিনা। ইহার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে জালিয়ান ওয়ালা-বাগে ও অন্যান্য স্থানে। আবার এই সেদিনও তাহারই পুনরাভিনয় হইল কালী-ঘাটে। নিরস্ত্র জনসঙ্ঘ—যাহাদের হাতে একটু বে-মানানসই বংশখণ্ড দেখিলেও অস্ত্র-আইনের কব্জায় আসে, তাহাদিগের প্রতি গুলি চালাইয়া কি ঘৃণ্য কাপুরুষতাই না দেখাইতেছে এই গোরার দল! কিন্তু এ সব বর্ব্বরতার জন্য দায়ী কে?

খোদ কর্ত্তাই নন কি? এই "মাকড় মার্‌লে ধোকড় হয়"-নীতিকে কি গবর্ণমেণ্টই প্রশ্রয় দিতেছে না? এই সব মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত খুন-খারাবী যে যত করিতে পারিবে তার তত পদোন্নতি তত চাপরাস বৃদ্ধি সরকারের দরবারে। অথচ সাধারণকে বলা যাইতেছে দোষ আমাদের নয় ইত্যাদি। যদি তাই হয়, তবে এই অবাধ হত্যা—নিরস্ত্র নির্দ্দোষ জনসঙ্ঘের উপর হাসিতে খেলিতে গুলি চালানো ব্যাপারটাকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দেয় কেন? বা সাধারণের কথায় কর্ণপাতই বা করে না কেন? এই একগুঁয়েমীর জন্যই ত আজ এমন করিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত একটা বিপুল কম্পন সুরু হইয়া গিয়াছে। এ ভূমিকম্পকে চাপা দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আর স্বেচ্ছাতন্ত্রের নাই! তেত্রিশ কোটি মানুষকে অবহেলা করিয়া ঘৃণা করিয়া তিন শত লোক তাহাদিগকে চাবুক মারিবে এবং তাহারা তাহা সহিয়া থাকিবে, সে দিন আর নাই। নেহাৎ অসহ্য না হইয়া পড়িলে মানুষে বিদ্রোহী হয় না। শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ যে কত কষ্ট কত যন্ত্রণায় তবে অশান্তিকে বরণ করিয়া লয়, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। এখন মনুষ্যত্ব না জাগুক, অন্ততঃ এই পশুত্বটুকু ও আমাদের মনে জাগিয়াছে যে, মনুষ্যত্বের অপমান সহার মত পাপ আর নাই। এ শিক্ষাও আমাদের ঠেকিয়া শিখিতে হইতেছে।

আমাদের সব কথাই ভূয়ো কর্ত্তাদের নিমক-হালাল ছেলে গুলির কাছে। এই সেদিন মিঃ শাস্ত্রী একটা সোজা কথা লাট-দরবারে পেশ করিয়াছিলেন যে, লোকগুলোকে মারিবার সময় একটু বুঝিয়া শুঝিয়া মারিও। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! বলা বাহুল্য, তাঁহার এ আর্‌জি বাতিল ও না-মঞ্জুর হইয়া গেল! কালা আদমীকে মারিবে,

তাহার আবার বুঝিয়া শুঝিয়া কি ? ইচ্ছা হইল, না,—বাস, চালাও গুলি ! মিঃ শাস্ত্রী সাতটি কথা পেশ করিয়াছিলেন, এবং তাহার যে-কোনটি সম্বন্ধে সরকারের অতিবড় নিমক হালালেরও কোন কিছু বলিবার ছিল না। অন্ততঃ আমরা তাহাই মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু "লোকদিগকে আগে সাবধান করিয়া দিয়া তবে গুলি ছুঁড়িবে" উপদেশটী ব্যতীত আর প্রায় সব ক'টিই নাকচ হইয়া গিয়াছে। মিঃ শাস্ত্রীর পাণ্ডুলিপিতে মোটামুটি এই কথা ক'টি ছিল :—প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে লিখিত হুকুম লইতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট না থাকিলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিবেন কিন্তু সকল দায়িত্ব তাঁহার এবং তাঁহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, গুলি না চালাইলে বহুপ্রাণ হানি বা ক্ষতি হইত ইত্যাদি। আরো কয়েকটী এই রকম সহজ কথা। কিন্তু কালা আদমি মারিতে এত সব বাঁধাবাধি নিয়ম কানুন ! বাপ ! বলে কি ? অতএব মিঃ শাস্ত্রীর কথা এক ফুঁয়ে উড়িয়া গেল !

আর, শুধু এ সাদাকেই দোষ দেওয়া বৃথা। দোষ আমাদেরই ; কিন্তু সে সব বলিতে গেলে সাদা দাদারা ভয়ানক রকমের চটিতং হইয়া যাইবেন এবং ক্রমান্বয়ে আমাদের মুখ বন্ধ, (হাত বন্ধ ত আছেই !) পা বন্ধ—শেষকালে কাঁচা মুণ্ডটাও খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন ! "হক কথায় আহম্মক রুষ্ট" তাই আমাদের অতি সোজা কথাটাও আইন বাঁচাইয়া বাঁকাটেরা করিয়া বলিতে হয়। আজো সাদাদের এই গুলি মারা লইয়া কিছু বলিবার দরকার নাই। তবে, আমাদের ক্রন্দন ব্যর্থ হইতেছে না। এই যে মানুষের ব্যথিত মনের অভিশাপ, ইহা অন্তরে অন্তরে তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতেছে। তোমাদের বিবেককে মনুষ্যত্বকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই গুলির সমস্ত গুলিই

তোমাদেরই হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়া তোমাদিগকে পচাইয়া মারিবে। আমরা জাগিতেছি—আমরা বাঁচিতেছি,—তোমরা মরিতেছ, তোমরাই ধ্বংসের পথে চলিয়াছ!

শ্যাম রাখি না কুল রাখি

—:*:—

বিহারের শাসনকর্ত্তা লর্ড সিংহ বাহাদুর ভয়ানক মুশ্‌কিলে পড়িয়া গিয়াছেন। ঠিক যেন সাপের ছুঁচো গেলা গোছ। ছাড়িতেও পারেন না, গিলিতেও পারেন না। সহযোগিতা-বর্জ্জন আন্দোলন বিহারে যে রকম জোরে চলিতেছে, সেরূপ আর কোথাও নয়। মহাত্মা গান্ধীও এই লইয়া সেদিন ইয়ং ইণ্ডিয়ায় বিহারের জোর প্রশংসা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বিহার গবর্ণমেণ্ট দস্তুর মত বে-সামাল হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। কেননা ইহার ছোটখাট: শাসনকর্ত্তারা রাগের বা ভয়ের চোটে যখন তখন যা তা করিয়া বসিতেছেন। সেদিন পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার উকিল দিগকে ধমকাইতে গিয়া অপ্রতিভের এক শেষ হইয়াছেন। তারপর মহকুমায় মহকুমায় জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট-গণ যে রকম সৃষ্টিছাড়া হুকুম জারি করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বোঝা যায় যে, বাস্তবিকই এবার তাঁহারা বিষম চটিয়াছেন। মদের উপকারিতা লইয়া যে সরকারী ইস্তাহার জারি হইয়াছিল, তাহার কেলেঙ্কারী আর বলিলাম না। লর্ড সিংহ বাহাদুর বড় অসময়ে লাট ও শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। এখন তিনি দেশের লোকের

মন যোগাইয়াও চলিতে পারেন না, আবার তাঁহার অধীন বিলিতি শাসনকর্ত্তাদিগকেও জোর করিয়া কিছু বলিতে পারেন না, পাছে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া বসেন! দেশের লোক এখন যাহা চায়, তাহাও যদি আবার তিনি বিনা বাধায় চলিতে দেন, তাহা হইলে তো আবার তাঁহাকে একদিনেই পাততাড়ি গুটাইতে হয়।

আর তাহা ছাড়া দেশের লোকের বর্ত্তমান দাবী-দাওয়া পূর্ণ করাও তাঁহার ক্ষমতার বাহিরে। একটা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে আমরা যতটা স্বাধীন মনে করি, আসলে তিনি ততটা স্বাধীন নন। তিনিও প্রকারান্তরে শুধু তাঁহার উপর-ওয়ালারই হুকুম তালিম করেন বলা যাইতে পারে। কাজেই বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক দেশের লোকে তাঁহার উপর বিষম চটিয়া উঠিতেছে এবং নানান রকমের টিকাটিপ্পনীও কাটিতেছে! এ হুলের বিষ-জ্বালা তাঁহাকে অতিকষ্টে নীরবেই সহ্য করিতে হইতেছে, কেননা আমরা ছেলেবেলায় পদ্য পাঠে পড়িয়াছি, "অসহ্য জ্ঞাতির বাক্য সহ্য নাহি হয়, সাপের মাথায় যেন ব্যাঙে প্রহারয়!" কিন্তু ইহাতে তাঁহার দুঃখ-কষ্ট অনুভব করা উচিত নয় কেননা সর্ব্ব প্রথম দেশীয় শাসনকর্ত্তা বলিয়া দেশের লোক তাঁহার নিকট অনেক কিছু আশা করিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মের বা গ্রহের ফেরে সমস্ত ওলটপালট হইয়া গেল। এখন তিনি দেশের লোককে সন্তুষ্টও করিতে পারেন না এবং খুব কশিয়া কড়া শাসন চালাইয়া তাহাদিগের মুখবন্ধ বা তাহাদের দোরস্ত করিতেও পারেন না। কেননা বেশী জোর জবরদস্তি করিলে দেশের লোক আরো বেশী ক্ষেপিয়া উঠিবে। মানুষের চামড়া কিছু গণ্ডারের চামড়া নয়, অতএব দেশ-ভাইএর এ আঘাত হয়ত তাঁহার গায়ে দারুণ বাজিবে। আজ যদি বিহারের শাসন কর্ত্তা কোন ইংরেজ

হইতেন, তাহা হইলে হয়ত দেশবাসী বিহার লইয়া এত বেশী আলোচনা করিত না। অথবা তিনি যে প্রদেশেরই লাট হইতেন, সেই প্রদেশের শাসন ইত্যাদি ব্যাপারে দেশের লোক বেশী করিয়া চোখ রাখিত। দেশীয় শাসনকর্ত্তার নিকট দেশভাইএর একটু বেশী অধিকারের দাবী বাড়াবাড়ি বোধ হইলেও অন্ততঃ অন্যায় নয়।

এ তো গেল এদিককার কথা। অন্য পিঠ—অর্থাৎ তাঁহার অধীন ইংরেজ শাসন কর্ত্তারা যত বেশী প্রভুভক্তি ও কর্ম্মকুশলতাই দেখাননা যেন এদেশী "নেটিভ" শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়া থাকিতে তাঁহাদের মর্ম্ম-স্থলে বেশ একটু বাজে এবং হিংসাও হয়। ইউরোপীয় গভর্ণর থাকিলে তাঁহারা (বিশেষ করিয়া বিহার প্রদেশ বলিয়া) অনায়াসে দেশী লোককে নেটিভ নিগার ইত্যাদি বলিয়া এ গোলমালে খুব একচোট গালি গালাজ করিয়া গায়ের ঝাল আর রসনার চুলকোনী মিটাইতেন, কিন্তু এখন আর ও রকম গালি গালাজ দিতে পারিবেন না, কেন না তাহা হইলে প্রকারান্তরে লর্ড সিংহকেই গাল দেওয়া হইবে। অথচ তাহারা এটুকুও বুঝিয়াছেন যে, ইউরোপীয় শাসনকর্ত্তার আমল অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর স্বাধীন ভাবে এখন দেশকে শাসাইতে পারিবেন। কেননা যতই হোক দেশীয় গভর্ণর তো! তিনি কিছুতেই ইহাদের এই নীতিকে একদম বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন না, কেননা তখন এই ইউরোপীয় "ডিমিনিউটিভ" শাসনকর্ত্তার দল দল বাঁধিয়া ইঁহার বিরুদ্ধে হে রৈ মাইরে লাগাইয়া উপরওয়ালার কাণে ঝালাপালা লাগাইয়া দিবে! এই সব এবং এই রকম আরো নানান গতিকে লর্ডসিংহ বাহাদুর চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি!" তিনি এখনো প্রাণপণে দু নৌকায় পা দিয়া আছেন বলিলেই হয়। কেননা এখন তিনি

হতাশ হইয়া বলিতেছেন, প্রকারান্তরে আমিও গান্ধিজিকে সমর্থন করিতেছি। তাঁহার মত তোমাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করাই আমার কাজ।

কিন্তু অবস্থা ক্রমেই যে রকম বিগড়াইয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহার আর এ "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাব চলিবে না।

আমরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছি না, বরং তাঁহার এ ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। দোষ তাঁহারও নয়, আমাদেরও নয়, এ দোষ বুরোক্রাসীর বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের।

যতক্ষণ দেশের আদত শাসনকর্ত্তা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক, যতক্ষণ দেশ পরাধীন থাকে, ততক্ষণ দেশীয় ছোটখাট শাসনকর্ত্তারা কিছুতেই দেশীয় লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ ভারতের বড়লাটও হন, তাহা হইলেও তিনি দেশের জন্য তেমন কিছু করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই তাঁহার বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হইবে। দেশীয় লোক যতবড় পদই পান, তবু তিনি যে দেশীয় বা "নেটীভ" একথা ইংরেজ কর্ত্তারাও ভুলিবেন না আর তিনি নিজেও ভুলিতে পারিবেন না। আজ যদি লর্ড সিংহ একটু দেশের লোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন, তাহা হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, ইংরেজ মন্ত্রীর দল কি রকম আপিস-তাপিস করিয়া উঠেন। তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন—"এক যাত্রায় পৃথক ফল!" এদোষ কাহারও নয় ভাই—দোষ আমাদের এই কাল চামড়ার!

লাট-প্রেমিক আলি ইমাম

হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী সার সৈয়দ আলি ইমাম বিলাতে গত ১১ই মার্চ্চ রাত্রে লর্ড এবং লেডি রিডিং-এর সম্মানার্থে এক ভোজ দিয়াছিলেন। সেই ভোজ-সভায় বক্তৃতা দিবার সময় তিনি মিঃ মণ্টেগুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, মিঃ মণ্টেগু ভারতের কল্যাণের জন্য মুক্তির জন্য প্রবল প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ভীষণ যুদ্ধ (অবশ্য বাকযুদ্ধ) করিয়াছেন! লর্ড হার্ডিঞ্জ আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত গত ১৯১৪ সালের মহাবিপদের সময় ভারতীয় সৈন্যদিগকে চটপট আসরে নামাইয়া ভারতীয়দিগের ভীষণ রাজভক্তির কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড রিডিং ভারতের লাটগিরি করিতে স্বীকৃত হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন! তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বলিদানে ভারত কৃতার্থ হইয়া যাইবে! ভারতের বর্ত্তমানে যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে এই রকম একজন গুণসম্পন্ন প্রতিভান্বিত ইংরাজ রাজপুরুষের ভয়ানক দরকার ছিল। তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জকে ভরসা দিয়া আরো বলেন যে, ভারতের উন্নতির জন্য বা সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহাতেই তিনি (না ডাকিতেই)

গিয়া হাত লাগাইতে পি ছপা নন।...লর্ড রিডিং প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমি সার আলি-ইমামের সব কথা মানিয়া লইতেছি, তবে তিনি আমার যে স্বার্থত্যাগের কথা বলিয়াছেন,তাহা—তাহা সত্য নয়! (অ্যাঁ,—যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!) যে কোন মহাপুরুষই হউন, ত্রিশ কোটি লোকের উপর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হওয়াটা তাঁর পক্ষে বড় সোজা কথা নয়! পরম করুণাময় চরম প্রসন্ন না হইলে কোন ভায়ার এ (গয়াসুরের) পাদপদ্ম লাভ হয় না। (অত্যধিক আনন্দে "মনে মনে" ঈশ্বরকে নমস্কার!) মস্ত বড় একটা বিরাট রকমের মহাপদপ্রাপ্তির জন্য আমি লাটের মলাটে নিজের নাম লিখাইতে রাজি হই নাই, আমাকে ঐ পদের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক ভাবিয়া লাট নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া আমার এই স্বার্থত্যাগ!" লর্ড রিডিং এইখানেই না থামিয়া হুড়হুড় করিয়া আরো বলিতে থাকেন যে, তিনি যে এত বিস্তৃততর একটা স্থান ও কাজ দেখাইবার সুযোগ পাইলেন ইহার জন্য তিনি গর্ব্বিত। এইবার তিনি দেখাইয়া দিবেন যে, তাঁহার কার্য্য-ক্ষমতা কত বেশী। এতদিন তাঁহাকে আইন অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইবারে তিনি বিবেক দিয়া বিচার করিতে পারিবেন। তাই এই ভারত-ত্রাতার পদমঞ্জুরী। তিনি "বহু আশা করিয়া" ভারত যাত্রা করিতেছেন যে, ভারত পঁহুছিয়াই তিনি দেশব্যাপী এমন এক জলবায়ুর সৃষ্টি করিয়া ফেলিবেন, যাহাতে গভর্ণমেণ্ট আর ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরে একটা সহানুভূতিপূর্ণ বোঝাপড়া বা লেখাপড়া হইয়া যাইবে। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন বলিয়া তিনি মহৎ আশা করেন! আ শ্চর্য্য কথাই কি না শুনিলাম! তাঁহার স্কন্ধে কতবড় দায়িত্বের জোঁয়াল চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রতিদিন

সকাল সন্ধ্যায় কাতর মিনতি জানাইবেন, যেন তিনি তাঁর ঐ গর্দ্দানের জোঁয়ালোপযুক্ত হন !

মিঃ মণ্টেগু তখন উঠিয়া নিজামের, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আলি ইমাম সাহেবের ও তাঁহার বেগম সাহেবার স্বাস্থ্য কামনা করিয়া……নিজাম যে গত যুদ্ধের সময় লোক-লশ্ কর গোলাগুলি দিয়া ইংরাজের ইজ্জৎ রক্ষা করেন, তজ্জন্য খুব গরমাগরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদিও ভারতের অবস্থা এখন জট-পাকানো জটার মতই জটিলতাপূর্ণ, তবুও তাঁহার আশা আছে এসব জট খুলিয়া যাইবে, এবং ইংরাজ ও ভারতীয়-দের মধ্যে একটা নূতন যুগের নব প্রেরণার আজানু-লম্বিত বাহুর আবির্ভাব হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় প্রেমে জড়াজড়ি করিয়া কসিয়া বাঁধিবে !

ইহার উপরে আর আমাদের কথা নাই ! এ যেন একেবারে "দুধকে দুধ, জলকে জল !"

সবাই তো নিজের নিজের মনের মতন কথাগুলি দিব্যি আওড়াইয়া গেলেন, কিন্তু যাহাদের জন্য এত নাড়ীর টান ইঁহাদের, তাহাদের কেমন লাগিল বা লাগিবে সেটা কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন ? রাজতন্ত্র, স্বেচ্ছা-তন্ত্র বা আমলাতন্ত্রের মজাই হইতেছে এই যে, কর্ত্তারা কেবল নিজের দিকটাই দেখেন। নিজেদের সুখ সুবিধাটাই তাঁহাদের লক্ষ্য—বাকী সব চুলোয় যাক, তাঁহাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই !

সার আলি ইমাম এখন লাট হইবার আশায় কতরকম চলানই চলাইবেন এবং কর্ত্তাদের মনস্তুষ্টির জন্য কত রকমেই না পুচ্ছ নাড়িয়া নিজের কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি জানাইবেন, কিন্তু সে আশা কি সফল হইবে শেষ পর্য্যন্ত ? ভারতের বিনা-জবাবদিহির লাট-মসনদে বসা

লইয়াও তিনি যাঁহার নিঃস্বার্থ ত্যাগ দেখিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া গুণ ব্যাখ্যা করিলেন বা খোত্‌বা পড়িলেন, তিনিই কিনা তাঁহার মুখের উপর এমন অপমানটা করিয়া বসিলেন, "না ভাই না, এতে আমার স্বার্থ-ত্যাগের কোন সুগন্ধই নাই—আমি বুদ্ধদেব নই; ত্রিশ কোটী মানুষ-মেষের রাখাল, পঞ্চাশটি হাজার করে' টাকা মাসহারা (যা দিয়ে ইংলণ্ডে দু-পাঁচটা লয়েড জর্জ্জ কিন্‌তে পাওয়া যায়), 'এ কি ভাই সবই ফাঁকি, সে লভ্য কি গেছ ভুলে?" লর্ড রিডিং সাংঘাতিক লোক, তাই খাঁটী সত্যিকথা (তা যত বড়ই অপ্রিয় হউক না) একেবারে মুখের উপর চাঁচা-ছোলা ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন! এঁদের কাছে বাবা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নাই, সোজা কথা সোজাসুজি বলিয়া দেওয়া,—বাস! ইহাতে তুমি রাগ, তো ঘরে বেশী করিয়া ভাত খাইবে! এ তো আর এদেশী রাজা মহারাজা নন যে, দুটো চাটুবাক্যের আঁচ দিয়াই তাঁহাদিগকে ননীর মতন গলাইয়া ফেলিবে!

সার আলি ইমামকে শুধু জিজ্ঞাসা করি, আমাদের গায়ের দাগগুলো কি এমন করিয়া মাখন ডলিলেই এত শীঘ্র মিলাইয়া যাইবে?—

"সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি,
তারই যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা চোখা বাণী,
এখনো শুঁতোর রেখা আছে লেখা পিঠের কূলে!—
আজই কি সবি ফাঁকি, সে কথা কি গেছ ভুলে?"

ভাব ও কাজ

—— :: ——

ভাবে আর কাজে সম্বন্ধটা খুব নিকট বোধ হইলেও আদতে এ জিনিস দুইটায় কিন্তু আসমান জমিন তফাৎ।

ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মত, একটা অবাস্তব উচ্ছ্বাস মাত্র। তাই বলিয়া কাজ মানে যে সৌরভ-বিহীন পুষ্প, ইহা যেন কেহ মনে করিয়া না বসেন। কাজ জিনিসটাই ভাবকে রূপ দেয়, ইহা সম্পূর্ণ ভাবে বস্তুজগতের।

তাই বলিয়া ভাবকে যে আমরা মন্দ বলিতেছি বা নিন্দা করিতেছি, তাহা নহে; ভাব জিনিসটা খুবই ভাল। মানুষকে কজায় আনিবার জন্ত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কোমল জায়গায় ছোঁওয়া দিয়া তাহাকে মাতাইয়া না তুলিতে পারিলে তাহার দ্বারা কোন কাজ করানো যায় না, বিশেষ আমাদের এই ভাব-পাগলা দেশে। কিন্তু শুধু ভাব লইয়াই থাকিব, লোককে শুধু কথায় মাতাইয়া মশ্গুল করিয়াই রাখিব, এও একটা মস্ত বদ-খেয়াল। এই "ভাব"কে কার্য্যের দাসরূপে নিয়োগ করিতে না পারিলে ভাবের কোন সার্থকতাই থাকে না। তাহা ছাড়া ভাব দিয়া লোককে মাতাইয়া তুলিয়া যদি সেই সময় গরমা-গরম কার্য্যসিদ্ধি করাইয়া

লওয়া না হয়, তাহা হইলে পরে সে ভাবাবেশ কর্পূরের মত উড়িয়া যায়। অবশ্য, এখানে কার্য্যসিদ্ধি মানে স্বার্থসিদ্ধি নয়। যিনি ভাবের বাঁশী বাজাইয়া জন-সাধারণকে নাচাইবেন তাঁহাকে নিঃস্বার্থ ত্যাগী ঋষি হইতে হইবে। তিনি লোকদিগের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাবকে জাগাইয়া তুলিবেন মানুষের কল্যাণের জন্য, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। তাঁহাকে একটা খুব মহত্তর উদ্দেশ্য ও কল্যাণ কামনা লইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে হইবে, নতুবা বানভাসির পর পলিপড়ার মত সাধারণের সমস্ত উৎসাহ ও প্রাণ একেবারে কাদা চাকা পড়িয়া যাইবে। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে, লোকের কোমল অনুভূতিতে ঘা দেওয়া পাপ। কেননা অনেক সময় অনুপযুক্ততা প্রযুক্ত ইহা হইতে সুফল না ফলিয়া কুফলই ফলে। আগে হইতে সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া বা কার্য্যক্ষেত্র তৈয়ার রাখিয়া তবে লোকদিগকে সোনার কাঠির ছোঁওয়া দিয়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। নতুবা তাহারা যখন জাগিয়া দেখিবে যে, তাহারা অনর্থক জাগিয়াছে, কোন কার্য্য করিবার নাই, তখন মহা বিরক্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িবে এবং তখন আর জাগাইলেও জাগিবে না। কেন না, তখন যে তাহারা জাগিয়া ঘুমাইবে এবং জাগিয়া ঘুমাইলে তাহাকে কেহই তুলিতে পারে না। তাহা অপেক্ষা বরং কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভালো, সে ঘুম ঢোল কাঁসি বাজাইয়া ভাঙানো বিচিত্র নয়।

এ কথাটা যে একটা মস্ত সত্যি, তাহা এতদিনে আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। এই যে সেদিন একটা হুজুগে মাতিয়া হুড়হুড় করিয়া হাজার কতক স্কুল-কলেজের ছাত্রদল বাহির হইয়া আসিল, কই তাহারা তো তাহাদের এই সৎ সঙ্কল্প, এই মহৎ ত্যাগকে স্থায়ীরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। কেন এমন হইল? একটা সাময়িক উত্তেজনার

মুখে এই ত্যাগের অভিনয় করিতে গিয়া স্পিরিটকে কি বিশ্রী ভাবেই না মুখ ভ্যামচানো হইল! যাহারা শুধু ভাবের চোটে না বুঝিয়া না শুঝিয়া শুধু একটু নামের জন্ম বা বদ্‌নামের ভয়ে এমন করিয়া তাহাদের স্পিরিট বা আত্মার শক্তির পবিত্রতা নষ্ট করিল, তাহারা কি দরকার পড়িলে আবার কা'ল এম্‌নি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিবে? আজ যাহারা মুখে চাদর জড়াইয়া কল্যকার ত্যক্ত বিশ্ববিত্থালয়ে আবার মুখটি চুণ করিয়া ঢুকিল, কা'ল দেশের সত্যিকার ডাক আসিলে তাহারা কি আর তাহাতে সাড়া দিতে পারিবে? হঠকারিতা করিয়া একবার যে ভোগটা ভুগিল বা ভ্রম করিল, তাহারই অনুশোচনাটা তাহারা কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবে না—বাহিরে যতই কেন লি-পরওয়া ভাব দেখাক না। এখন সত্যিকার ডাক শুনিয়া প্রাণ চাহিলেও সে লজ্জায় তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতে পারিবে না। এইরূপে আমরা আমাদের দেশের প্রাণশক্তি এই তরুণদের স্পিরিটটাকে কুব্যবহারে আনিয়া মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধনই করিতেছি না কি? রাগিবার কথা নয়, এখন ইহা রীতিমত বিবেচনা সাপেক্ষ। আমাদের এই আশা ভরসাস্থল যুবকগণ এত দুর্ব্বল হইল কিরূপে বা এমন কাপুরুষের মত ব্যবহারই বা করিল কেন? সে কি আমাদেরই দোষে নয়? সাপ লইয়া খেলা করিতে গেলে তাহাকে দস্তুরমত সাপুড়ে হওয়া চাই, শুধু একটু বাঁশী বাজাইতে পারিলেই চলিবে না। আজ যদি সত্যিকার কর্ম্মী থাকিত দেশে, তাহা হইলে এমন সুবর্ণ সুযোগ মাঝ মাঠে মারা যাইত না। ত্যাগী অনেক আছেন দেশে, কিন্তু কর্ম্মীর অভাবে বা তথা-কথিত কর্ম্মী নামে অভিহিত লোকেদের সত্যসাধনার অভাবে তাঁহারা কোন ভাল কাজে আর কোন অর্থ দিতে চাহেন না

বা অন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতেও রাজি নন। কি করিয়া হইবেন? তাঁহারা তাহাদের চোখের সামনে দেখিতেছেন যে, কত লোকের কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ধন দেশের নামে কল্যাণের নামে আদায় করিয়া বাজে লোকে নিজেদের উদর পূর্ণ করিতেছে। যাঁহারা সত্যিকার কর্ম্মী সে বেচারারা সত্যি কথা স্পষ্টভাবে বলিতে গিয়া এই সব কর্ম্মীদের কারচুবিতে পুয়ালচাপা পড়িয়া গিয়াছে। বেচারারা এখন ভাল বলিতে গেলেও এই সব মুখোস-পরা ত্যাগী মহাপুরুষগণ হট্টগোল বাধাইয়া লোককে সম্পূর্ণ উল্টা বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে একদম খেলো ঝুটা ইত্যাদি প্রমাণ করিয়া দেন। সহজ জনসাধারণের সরল মন এ সব না ধরিতে পারার দরুণ তাহাদের মন অতি অল্পেই ঐ সত্যি-কার কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে বিষাইয়া উঠে। দশচক্রে ভগবান ভূত কথাটা মস্ত সত্যি কথা।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? এক সহজ উপায় এই যে, এখন হইতে জনসাধারণ বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতি-মাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভাল মন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। ভাব জিনিষটা মদের নেশার চেয়েও গাঢ়। পাঁড় মাতালরা বলে, "মদ খাও কিন্তু তোমায় যেন মদে না খায়"। আমরাও বলিব, ভাবের সুরা পান কর ভাই, কিন্তু জ্ঞান হারাইওনা। তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্ম্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন! ভাবের দাস হইও না, ভাবকে তোমার দাস করিয়া লও। কর্ম্মে শক্তি আনিবার জন্য প্রাণে অনুপ্রাণতা বা প্রেরণা জাগাইবার জন্য ভাব সাধনা কর। স্পিরিট বা আত্মার শক্তিকে জাগাইয়া তোল কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মকে হারাইও না। অন্ধের মত কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া

ভেড়ার মত পেছন ধরিয়া চলিওনা। নিজের বুদ্ধি নিজের কর্ম্ম শক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এ সব জিনিস ভাব আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্য্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে ইহার ফল কি। শুধু হোড়ের মত বা উদ্‌মো ষাঁড়ের মত দেওয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁসড়াইয়া নিজের চামড়া তুলিয়া ফেলা হয় মাত্র। দেওয়াল প্রভু কিন্তু দিব্যি দাঁড়াইয়া থাকেন। তোমার বন্ধন ওই সামনের দেওয়ালকে ভাঙিতে হইলে একেবারে তাহার ভিত্তিমূলে কোদাল শাবল মারিতে হইবে।

আবার বলিতেছি, আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্য্যের সম্ভাবনা অসম্ভাবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিয়া পরে কার্য্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার স্পিরিট বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোন অধিকার নাই। তাহা পাপ—মহাপাপ!

সত্য-শিক্ষা

—০ঃঃ০—

তোরণে তোরণে ভৈরব-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে "জাগো পুরবাসি !" দিকে দিকে মঙ্গল-শঙ্খে তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়া আমাদের রক্তে রক্তে ছায়ানটের নৃত্যরাগ তুলিয়াছে। এই যে আমাদের জীবনের উন্মাদ নট-নৃত্য, এ শুধু বিশ্বের কল্যাণ-মুক্তিতে নয়, এই মুক্তি-যুগে আমরাও আমাদের ভাবী সিংহদ্বারের পূর্ব্বতোরণে নহবতের বাঁশী শুনিয়াছি বলিয়া। তাই আর আমরা শুধু দার্শনিকের ভিতরের-মুক্তিতে সন্তুষ্ট নই, এখন চাই বাইরের ব্যবহারিক জীবনে মুক্তি। এই "আজাদী"র সাড়া না পাইলে আমাদের জীবনে আজ এমন তরুণের উচ্ছৃঙ্খলতা, সবুজের স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দিত না। রক্ত-নিশান লইয়া আজ আমাদের নূতন করিয়া যাত্রা শুরু; এই শোভা-যাত্রার দুর্ম্মদ অগ্র-যাত্রী আমাদের যে কিশোর আর তরুণের দল, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগেরই অন্তরে বাহিরে "আজাদী"র নেশা জমাইয়া তুলিতে হইবে। কারণ, ইহাদেরই নৃত্য-বিদ্রোহে অলস ভীরু জীবন-পথযাত্রীর বুকে সাহস সঞ্চার হইবে। আমরা কিন্তু আমাদের এই উন্মুক্ত উদার প্রাণগুলির চারিপাশে নিত্য বন্ধনবাধা সৃজন করিয়া তাহাদিগের উচ্ছল গতিকে

অচল করিতেছি। তাই বিজাতির বিভিন্ন শৃঙ্খল কাটিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমরা আজ এত আনন্দধ্বনি করিতেছি। যাহাতে এই জাগরণ-যুগের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বাহিরে না হইয়া অন্তরে হয়, সেই জন্যই আমরা এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। আজ ইংরাজের সহযোগিতা বর্জ্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন-প্রকারেণ দুই একটা ঠাটকবাজি-গোছ জাতীয় স্কুল-কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অ-সহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ "হনুকরণে" পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। পরের সমস্ত ভালো মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায় আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব্বই করা হয়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। তাই, এই সহযোগিতা বর্জ্জনের দিনে "খোশখবর কা ঝুটা ভি আচ্ছা" স্বরূপ আমাদের দীর্ঘ পরিপোষিত আশার কার্য্যে পরিণত হইবার কথা শুনিয়া গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাহাদের মুঞ্জরিত জীবন-পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বলপ্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে-অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস অকেজো করিয়া তোলা হইবে

না,—ইহা কি কম সুখের কথা! তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্ম্মের সত্য,—দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে,—তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্ম্মীর ত্যাগ ও কর্ম্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া,—ইহা কি কম আনন্দের কথা! তাই আবার বলিতেছি শুধু হুজুগে মাতিলে চলিবে না, গলাবাজির চোটে ষ্টেজ ফাটাইয়া তুলিলে হইবে না,—আমরা দেখিতে চাই কোন্-নেতার চেষ্টায় কোন দেশ-সেবকের ত্যাগে কতটি জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল, আমরা দেখিতে চাই, আমাদের কতগুলি তরুণের বুকে এই মহাশিক্ষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! আমরা দেশ-সেবক চিনিব ত্যাগে, বক্তৃতায় নয়। আমরা দেখিতে চাই কবির ভবিষ্যদ্বাণী "আসিবে সে দিন আসিবে" গান দিকে দিকে বৈতালিক-কণ্ঠে বিঘোষিত হইতেছে,—"দিন আগত ঐ।"

জাতীয়-শিক্ষা

—০:❀:০—

কথায় বলে, "টকের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলে বাসা!" আজকাল "জাতীয়-শিক্ষা" "জাতীয়-শিক্ষা" বলিয়া যে একটা বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে দেশে, ইহার প্রতিও উক্ত ব্যঙ্গোক্তি দিব্যি খাটে! সরকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয় হয় বলিয়াই যদি আমরা তাহাকে তালাক দিই, তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মত শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ঐ সরকারী বিদ্যালয়েরই নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে টকের ভয়ে আমরা বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর এক রকম "টকবৃক্ষ-"-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল।

শুনিয়াছি, বন্দেমাতরমের যুগে যখন স্বদেশী জিনিসের সওদা লইয়া দেশময় একটা হৈ হৈ ব্যাপার রৈ রৈ কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল, তখন অনেক দোকানদার বা ব্যবসায়ীগণ বিলাতী জিনিসের ট্রেডমার্ক বা চিহ্ন দিব্যি চাঁচিয়া-ছুলিয়া উঠাইয়া দিয়া তাহাতে একটা স্বদেশী মার্কা মারিয়া লোকের নিকট বিক্রয় করিতেন। এখন যে পদ্ধতিতে জাতীয়-শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া

হইতেছে তাহাও ঠিক ঐ রকম বিলিতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া "স্বদেশী" মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত। শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ওরকম এক-আধটু নূতনত্ব যে-কেহ একটা নূতন জিনিসে লাগাইতে পারে। যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র,তাহাকে কি বলিয়া কোন্ লজ্জায় 'হামারা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব—যাহাদিগকে মুখ ভ্যাম-চাইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাহাদেরই হুবহু "হনুকরণ" করি-তেছি! জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষাদাতা কর্ত্তাদের সম্বন্ধে আমরা আজ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা খারাব বলিতে আমাদেরই বক্ষে বাজিতেছে। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামী দিয়া কখনও মঙ্গল উৎসবের কল্যাণ-প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সুতা কাটানো ছাড়া এ ন্যাশন্যাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলে-দের মনের বা এ দেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এ সবই ইংরেজী কায়দাকানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগরা জুতা পরাইয়া এদেশী করা; অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ। এর পূর্ব্বে স্বদেশী যুগে যখন আর একবার এই রকম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনো এই ব্যাপার ঘটিয়া সব কিছু পণ্ড হইয়া গিয়াছিল।

এ সব দোষ ত আছেই, তাহা ছাড়া একটা এমন ব্যাপার এখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে যাহা কিছুতেই মার্জ্জনা করা যায় না। যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কি নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দুটো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুণ ইঁহারা অনেকেই নিজের রুটীর যোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। আজ আমরা তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এখনো এই রকম ব্যাপার চলিতে থাকে, তবে বাধ্য হইয়া আরো অনেক অপ্রিয় সত্যকথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। পবিত্রতার নামে, মঙ্গলের নামে এমন জুয়াচুরিকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের ভবিষ্যৎ একদম ফর্সা! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বা দেশের লোক কতকগুলো ভূতের বাথান ও আখড়া পাকাইবার জন্য বুকের রক্তসম টাকার আড়ি হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন ইংরাজী মেম-ভারতীর জুতো-পরা পায়ে নয়, বাগ্‌দেবী ভারতী-বীণাপানির কমল পায়ে। এর চেয়ে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া "খোঁড়া ওজর" দেখাইলে চলিবে না, তাঁহারা ইহার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন কি?

চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না ; 'মাছ দিয়া শাক ঢাকা যায় না'। কাঁচা অধ্যাপক মানে বয়সে কাঁচা নয়, বিদ্যায় কাঁচা। আমাদের আর সবই ভালো, কেবল বে-বন্দোবস্তীই হইতেছে "গুণরাশিনাশী।" গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত তদুপরি আবার আমাদের এক-গুঁয়েমিও আছে। দোষ করিতেছি জানিয়া শুনিয়াও তাহা শুধরাইব না। যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য সকল স্বার্থ বলিদান দিয়া গোলাম-খানা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন মনে করিয়াছিলাম, আজ যদি কর্ম্মগতিকে দেখিতে পাই বা বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা অন্য এক স্বার্থের লোভে বা বেশী লাভের সম্ভাবনায় ও-রকম লোক-দেখানো ত্যাগ দেখাইয়াছেন, তাহা হইলে বড় কষ্ট বোধ হয়। এখন কিন্তু অনেকেরই কার্য্য দেখিয়া সেই রকম বোধ হইতেছে। যে সব অধ্যাপক গোলামখানা ছাড়িয়া আমাদের বাহবা লইয়াছেন, তাঁহাদিগকেই যে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কেননা তাঁহারা কখনো এই ত্যাগের বদলে আর একটা বড় রকম লাভের আশায় এ ত্যাগ দেখান নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আরো অনেকে লাফাইয়া উঠিয়া এই রকম মিথ্যা ভণ্ডামীর ত্যাগ দেখাইতে ছুটিতে পারে। কেননা ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি তো হইলই না, উল্টো দেশময় একটা বাহবা পড়িয়া গেল যে,অমুক লোকটা একেবারে ত্যাগের চূড়ান্ত করিয়াছে—একেবারে বুদ্ধদেব! কিন্তু এ মিথ্যাকে আর যেই প্রশ্রয় দেন, আমরা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মঙ্গল উৎসবে মিথ্যার অমঙ্গল কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিব না। আমরা অন্তর হইতে বলিতেছি, সত্যকে এড়াইয়া চলিও না, ইচ্ছা করিয়া বা স্বার্থান্ধ হইয়া এমন মহৎ অনাবিল অনবদ্য জিনিসকে পঙ্কিল-কলঙ্কিত করিও না,—যদি বুঝি তুমি বুঝিবার দোষে তাহা করিতেছ ;

ভণ্ডামী করিতেছ না, তবে তোমায় প্রাণ হইতে দেশবাসী ক্ষমা করিবে, স্নেহের দাবী লইয়া তোমার ভুল শুধরাইয়া দিবে, এবং তোমার গায়ে কাঁটাটিও ফুটতে দিবে না। যে সত্যিকার ত্যাগী, তাঁহার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমরা দাঁত দিয়া তুলিয়া দিতে রাজী আছি। দোষ রাজতন্ত্রের নয়, দোষ আমাদেরই। আমরাই নিত্য নিতুই মঙ্গলের নামে দেশের নামে নিজের নিজের স্বার্থ বাগাইয়াত্তো লইতেছি। এই ভণ্ডামী আর মোনাফেকীই তো সর্ব্বনাশের মূল! প্রথমে আমাদিগকে মানুষ হইতে হইবে, স্বার্থের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্যকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে, তাহার পর যেন বড় কাজে হাত দিই। সেবার জাতীয় বিদ্যালয় অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, এবারও যদি ঐ রকম হয়, তাহা হইলে লজ্জায় আর আমাদের মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না। যাঁহারা সত্যিকার কর্ম্মী তাঁহারাও কি অসত্যের জঞ্জাল হইতে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবেন না? মিথ্যাকে সহ্য করার মত কাপুরুষতা আর পাপ নাই। মহান কোন কাজে অতি প্রিয়জনের দোষ দেখিলেও তাহা লুকাইলে চলিবে না। লোক-লজ্জা বা মুখ-চোরা জিনিসটাই আমাদিগকে এমন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধুর মর্য্যাদার চেয়ে সত্যের মর্য্যাদা অনেক উপরে।

তাহা ছাড়া, এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকিউলাম কি? ষ্টাণ্ডার্ডেরই বা কোন একটা নিয়ম-কানুন বা প্রোগ্রাম আদি আছে কি? হইবে কখন? সকলেই তো দেখি, বসিয়া বসিয়া মাছি মারিতেছেন। অথচ কাঁদুনী গাহিতেছেন, "ছেলে জুটিতেছে না আবার গোলামখানায় গিয়া ঢুকিতেছে" ইত্যাদি! কিন্তু এই সব কাণ্ড দেখিয়া কয়জন বদ-সাহসী ছেলে ইহাতে আসিতে পারে? ভাল করিয়া কোমর

বাঁধিয়া লাগিয়া যাও তো, দেখিবে তোমায় তখন ডাকিতে হইবে না—আপনিই তোমার অঙ্গন-ভরা লক্ষ তরুণ কণ্ঠে "হাজির" "হাজির" রব উত্থিত হইবে। তোমার মন্ত্রে যদি ভুত না ছাড়ে, তবে সে তোমার দোষ বা ক্ষমতার অভাব, তাহা মন্ত্রের দোষ নয়। নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠান বাঁকা বলিয়া আক্ষেপ করা—ধৃষ্টতা আর বোকামী মাত্র।

আমরা চাই, আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবন-শক্তিকে ক্রমেই সজাগ জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলে-দের দেহ মন দুইকেই পুষ্ট করে সজীব করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। "মেদা-মারা" ছেলের চেয়ে সে হিসাবে "ডাং পিটে" ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্ব্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের "জান" থাকে না, আর যাহার জান নাই সে মোর্দ্দা দিয়া কোন কাজই হয় নাই আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে—প্রাণ শক্তি আর কর্ম্ম শক্তিকে একত্রীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। শত্তুরে যেন ইহাকে গোলাম-খানারই তেলাম-খানা না বলিতে পারে!

জাগরণী

—:::—

বকুল! জা—গো! জাগো বকুল, এই পল্লীমাঠের পথের পাশে মেঠো-গানের সহজ সুরে জাগো। জাগো তারই রেশের ছোঁয়ায়! জাগো বেদন নিয়ে, পল্লী-শিশুর মুক্ত-বিথার প্রাণ নিয়ে, পল্লী-তরুণের তাজা খুনের তীব্র কাঁপুনি নিয়ে! জাগো,—জাগো বকুল,—জাগো! শরম-রাঙা পাপ্‌ড়ি ক'টি তোমার খুলে' দাও—ছড়িয়ে দাও এই নবীন আষাঢ়ের কালো মেঘের জোলো ঝাপ্‌টায়। সঙ্কুচিতা, ভীতা, ত্রস্তা বকুল! ছোট্ট বকুল! জাগো!! জাগো—পরাগ-মাখা পবিত্র তোমার ধৌত-করুণ চাউনি নিয়ে,—এই বাদর-রাগিণী-আহত বাদল-প্রাতে। তোমার পরিমলের উদাস সুরভি নিয়ে এসে আমেজ দাও রাজার যত গুল-ভরা বাগিচায়। অনাদৃতা তুমি, তাই বলে' তোমার ওই এক নিশ্বাসের সুরভিটুকু নিয়ে গর্ব্বিতার মত এসো না। এস তুমি আধ-মুকুলিত-যৌবনা নববধুর মত ধীর-মন্থর চরণে—পায়ের মুখর পায়জোর সাম্‌লে! লাজ-জড়িমা-জড়িত তোমার বুক ভরে' থাকে যেন পুত শালীনতার সংযম আর প্রশান্ত-প্রীতির স্নিগ্ধ শান্তি! জাগো বকুল, জাগো! তুমি যেখানে ফোট, সেই পল্লীতেই আছে আমাদের সত্যিকার বাঙ্‌লা,—বাঙালীর আসল প্রাণ। আমাদের এই শাশ্বত-বাঙালীর

সুষুপ্ত, ঘুমে-ভরা অলসপ্রাণ জাগিয়ে তোল তোমার জাগরণের সোণার কাঠি দিয়ে! তাদের ফুলের প্রাণে দাগ বসিয়ে দিয়ো তোমার মদির-বাসের উন্মাদনার ছুরি হেনে! জাগো বকুল, জাগো! ওই রাজবাগানের ফুল-বান্দাদের সালাম কর আর তোমার অশ্রু-ভরা অভিনন্দন জানাও ছোট্ট তুমি, এই পল্লী-বাটের পায়ে-চলার-পথে থেকে তাদিকে তোমার বুকভরা ভক্তি-ভালোবাসা নিবেদন কর। তোমার ঐ পরাগালক্ত নিবেদিত অর্ঘ্য নিয়ে সে গুলবাহার-পরা সুন্দরীদের বল,—"ওগো, আমি ছোট্ট বকুল—নেহাৎ ছোট্ট! আমি জেগেছি! তাও সে অনেকদূরে পল্লীর অচিন্-পথে। তোমরা আমায় ঘৃণা করো না! আমি আন্‌বো শুধু আমার পল্লী-দুলালদের বুকের বেদন, তাদের খাপ্-ছাড়া আকুল আবদার আর যুগ-যুগ-ধরে'—পিষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণের ব্যথা-বিজড়িত সহজচিন্তার স্মৃতি। এ বাছাদেরও ঘৃণা করো না,—অবহেলা এদের প্রাণে বড্ডো বাজ্‌বে! শিশু এরা—কুঁড়ি এরা, এখনও ফোটেনি। এরা তোমাদের দেশের হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া রেণুকা। দিয়োগো দিয়ো, তোমাদের ঐ রাণীর স্নেহের শুধু একটি রেণু, উড়িয়ে দিয়ো দখিণ বায়ে এদের পানে! আহা, অনাদৃত বিড়ম্বিত হতভাগা এরা, ঘৃণা করো না এদের!"...জাগো বকুল, জাগো! ঝোড়ো হাওয়ায় আর জোলো মেঘে তোমায় ডাক দিয়েচে। জাগো—জাগো, পল্লী-বুকের বেদন নিয়ে, পল্লী-শিশুর ঝর্ণা-হাসি নিয়ে আর তরুণদের সবুজ-বুকের অরুণ খুনের উষ্ণগতি নিয়ে! জাগো, মুকুল জাগো!! জাগো যৌবনের জয়টীকা নিয়ে!!!